শুভ্র বর্ষণ

শুজা রশীদ

অনন্যা প্রকাশনী

১

হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করছে টেলিফোনটা। ঘড়ি দেখলো দীপু। রাত তিনটা দশ। নির্ঘাত দেশ থেকে। লেপটাকে শরীরের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়ালো ও। দ্রুত হিসেব কষলো-দেশে এখন বিকেল ২টা দশ। এমন সময়ে বাবা-মা কখনো ফোন করে না। একহাতে লুঙ্গী সামলাতে সামলাতে নিজের ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো দীপু। রাতে ঘুমাতে যাবার আগে ফোনটাকে লিভিংরুম থেকে খুলে নিজের ঘরে নিয়ে যায় ও, গতরাতে সেটা করা হয়নি এবং কি আশ্চর্য, গুণে গুণে সেই রাতেই দেশ থেকে ফোন এলো। চতুর্থবারের মতো রিং হচ্ছে, আনসারিং মেশিনটা এর পরের বারেই ধরে বসবে। একরকম ছোঁ মেরে রিসিভার তুললো দীপু।

-হ্যালো।

-কে, দীপু ভাই নাকি? নারী কন্ঠ। কিঞ্চিৎ রুক্ষ। নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না দীপুর। এই মেয়ে রাত তিনটার সময় কোন জ্ঞানে ফোন করে? চব্বিশ বছরের ধাড়ী মেয়ে, কান্ডজ্ঞান বলে কিছু থাকতে নেই? আশ্চর্য!

-কি হলো কথা বলছেন না কেন? ফোন কানে লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? এই দীপু ভাই-ই-ই......

দীপু রাগ চাপা দেবার যথাসম্ভব চেষ্টা করলো।

-কি ব্যাপার আভা? এতো রাতে ফোন করলে!

-ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নাকি?

-না। তোমার কলের জন্য জেগে বসে ছিলাম।

আভা বিশেষ আমল দিলো না। -তারপর, খবর কি বলেন। অনেক দিন ফোন করেন না। ভুলে-টুলে গেলেন নাকি?

-আমি ভালো। তুমি কেমন আছো?

-চলে যাচ্ছে। দেশে যাচ্ছি।

-কবে?

-আগামীকাল দুপুরে ফ্লাইট। নিউইয়র্কে বারো ঘন্টার মতো থাকতে হবে। তারপরে কানেকটিং ফ্লাইট। তিনটার দিকে জে.এফ.কে (JFK) তে চলে আসবেন। বেশী দেরী করবেন না। অপেক্ষা করতে আমার জঘন্য লাগে।

দীপু মনে মনে প্রমাদ গুনলো। এই মেয়ে সাদা বাংলায় ঝামেলা। বিশেষ করে দীপুর জন্যে। সেই দীর্ঘ যন্ত্রণার ইতিহাস এই মুহূর্তে ভুলে থাকার চেষ্টা করলো ও।

-আমার অফিস আছে কাল।

-তাতে আমার কি? এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। বারো ঘন্টা এয়ার পোর্টে হাঁ করে বসে থাকবো নাকি।

লাইন কেটে গেলো। দীপু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। এই মেয়ে তার জীবনকে বারো ভাজা করে খেলো। দেশে বিদেশে কোথাও শান্তি নেই। পনেরো বছর বয়স থেকে শুরু করে আজ অবধি জ্বালিয়ে খাচ্ছে। রিসিভারটাকে ক্রাডলে আছড়ে ফেলে বিছানায় ফিরে গেলো দীপু। এমনিতেই রাতে ভালো ঘুম হয় না ওর। তার পরে মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে দু চোখের পাতা এক করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। মিনিট দশেক গড়াগড়ি করে বিছানা ছাড়লো ও। লিভিং রুমের সাথে লাগোয়া ঝুল বারান্দা। কাঁচের স্লাইডিং ডোরটা ৬ ইঞ্চি ফাঁক করে মুখটাকে কোনরকমে সেই ফাঁকে গুজে

দিয়ে সিগ্রেট ধরালো ও। অসম্ভব ঠান্ডা বাহিরে। ১০° - ১৫° ফারেনহাইট হবে। নিউ ইংল্যান্ডের শীতের বিশেষ দুর্নাম আছে। প্রথমতঃ শুরু হলে শেষ হবার নাম নেই। দ্বিতীয়তঃ যখন তখন তুষার পড়ে বাড়ী-ঘর-মাঠ-ঘাট সব সয়লাব। তৃতীয়তঃ প্রচন্ড ঠান্ডায় নাতিশীতোষ্ণ এলাকার প্রবাসীদের মাংস-মজ্জা জমে যাবার দশা হয়। মোটের উপরে শীতকাল এলেই দীপুর কলিজা শুকিয়ে যায়। দেশের হালকা ঠান্ডাতেই তার সর্দি কাশি হয়ে এলাহী কাণ্ড বেঁধে যেতো।

সিগ্রেটটা মাঝামাঝি যেতেই ছুড়ে ফেলে দিলো ও। অসম্ভব শীতল বাতাস। স্ল-াইডিং ডোরটা সশব্দে বন্ধ করলো। এপার্টমেন্টে সিগ্রেট খেতে পারলে এই শীতল যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যেতো; কিন্তু ঘরে তামাকের গন্ধ অসহ্য লাগে। বিশেষ করে এই দেশে অফিস-আদালতে কোথাও ধুমপান চলে না। বাইরে গিয়ে সিগ্রেট টানাটা দীপুর অভ্যাস হয়ে গেছে।

আবার বিছানায় ফিরে গেলো ও। ভালো সমস্যায় ফেলে আভা। দু'দিন আগেই হাফ-ডে ছুটি নিয়েছে ও। আবার হাফ ডে! বস না ক্ষেপলেই হয়!

২

এদেশের ম্যানেজমেন্টকে ক্ষেপানো কঠিন কাজ। ম্যানেজিং এর ষোলকলা তাদের জানা। কোরবাণীর গরুকে খাইয়ে দাইয়ে নাদুস-নুদুস করার মতো অবস্থা। তাদের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে- কাজ আদায় করা। কখনো হাসি মুখে, কখনো মাথায় হাত বুলিয়ে, কখনো হালকা খোঁচা দিয়ে বেশ একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। দু' চারটে পদস্খলন তারা নির্বিবাদে হজম করে ফেলে। পয়সা দিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে 'গুড বাই' বলাটা তাদের অভ্যাস নয়। রোজমেরী দীপুর ম্যানেজার। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স মহিলার। মাঝারী উচ্চতা, শরীরের গাঁথুনী এখনো চমৎকার। পোশাকে আষাকে আভিজাত্যের ছাপ আছে। দীপুর অনুরোধ শুনেই তার মুখে একটুকরো রহস্যময় বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো।

-এই না সেদিন হাফ ডে হয়ে গেলো।

-আমার কি দোষ! আমার দুঃসম্পর্কের বোন আসছে ডালাস থেকে, তাকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। এই মেয়ে যা ঝামেলা করে।

-এই রকম ঘন ঘন হাফ ডে নিলে কাজ চলবে কি করে?

-খুবই সত্যি কথা। আমি তোমাকে মেয়েটার ফোন নাম্বার দিচ্ছি। তুমি তাকে একটা ক্যাবে চলে আসতে বলো।

রোজমেরী হেসে ফেললো। -খুব শয়তান হচ্ছো। কাল সকালে খোঁজ নেবো, যদি অফিসে না দেখি পিটিয়ে তক্তা করবো।

-নো প্রবলেম।

রোজমেরী হাত ঝাড়া দিলো-যাও, ভাগো। বোন না ছাই!

-খোদার কসম, বোন। দুঃসম্পর্কের যদিও।

-হ্যাঁ, আমাকে গাধা পেয়েছো।

-মেয়েটির ফোন নাম্বার দিচ্ছি, তুমি ওকেই জিজ্ঞেস করো।

-হ্যাঁ, আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। ভাগো।

দীপু ফুটলো সেখান থেকে। এরপরে কথা চালানোর অর্থ হচ্ছে বিপদ সৃষ্টি করা। বোষ্টন থেকে নিউইয়র্ক কম করে হলেও তিন ঘন্টার ড্রাইভ। ঘড়ি দেখলো ও, বারোটা। সাড়ে তিনটার দিকে পৌঁছতে পারলেও চলে। কিন্তু এই মেয়ে যে ঠোঁট কাটা, দশটা কথা শুনিয়ে ছাড়বে। মানুষ বলে গণ্য করে না। পাক্কা তিন, সাড়ে তিন ঘন্টা ড্রাইভ করে গিয়ে শক্ত কথা শুনতে কার ইচ্ছে হয়। দীপু গাড়ীতে ঝড় তুলে দিলো। এই সময়ে হাইওয়েগুলোতে ভীড় কিছু কম থাকে। বিশেষ করে 495 এ। এক মিনিটেই পঁচাশির ঘর পেরিয়ে গেলো। ফ্রি ওয়ে 84 এ ধরা খেয়ে গেলো দীপু। এদেশের হাইওয়ে পেট্রোল মহা ধড়িবাজ। ফ্রিওয়ের দু'পাশ ঘিরে বনানী। তার মধ্যে সযত্নে গাড়ীটাকে লুকিয়ে রাডার ধরে বসে থাকে। স্পীড লিমিটের দশ পনেরো মাইলের উপরে গেলেই-ব্যস। কেলা ফতে! লাল নীল বাতি জ্বলে উঠবে। এদেশে এসে অবধি গত চার বছরে বার চারেক এই বাতির চক্করে পড়েছে দীপু। ষ্টপ সাইন টপকে যাবার জন্য একটা টিকেট খেতে হয়েছে, গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন সময় মতো না করার জন্য একবার, আর বার দুয়েক স্পিডিং এর জন্য। মায়ের অসুখ, দাঁতে ব্যথা বলে দু'বারই কোন রকমে কাটিয়ে দিয়েছে। আজ সেই লেকচারে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। স্পীড লিমিট ৬৫, সে যাচ্ছিলো ৯৫। স্রেফ জবাই করবে আজকে। লাল নীল বাতি দেখেই রাস্তার পাশে গাড়ী থামিয়ে দিলো দীপু। শেষ মুহূর্তে লুকিয়ে থাকা পুলিশটাকে দেখেছিলো ও, ব্রেকটাও বেশ জোরেই করেছিলো কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। খুব ধীরে সুস্থে, মহারাজার মতো গাড়ী থেকে নামলো যুবক পুলিশটা। এদেশের টিভিতে, মুভিতে পুলিশের বীরত্বের এমন ছড়াছড়ি যে বাস্তবের পুলিশদের সবারই হিরো হিরো ভাব। ভদ্রলোক বেশ হেলেদুলে দীপুর জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। -ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, ইন্সুরেন্স। টপাটপ লাইসেন্স বের করলো দীপু। ইন্সুরেন্স পাওয়া গেলো, রেজিস্ট্রেশনের হদিস নেই। খুঁজে পেতে ওয়ালেটের ভেতরেই পাওয়া গেলো কাগজের টুকরোটিকে। বাঁচোয়া। নইলে হাজতে চালান হয়ে যাবার একটা চান্স ছিলো। অফিসার কাগজপত্র সব হাতিয়ে নিয়ে নিজের গাড়ীতে ফিরে গেলো। কম্পিউটারে খোঁজ খবর নেয়া হবে। দীপু ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। একেই বলে মড়ার উপরে ঘাঁড়ার ঘা। এই ব্যাটা অফিসারের যদি কোন আক্কেল থাকে, দরকার অদরকার বোঝে না। মিনিট পাঁচেক পরে শম্বুক গতিতে ফিরে এলো যুবক অফিসার। কাগজপত্র হাত বদল হলো। -তোমার স্পীড কতো ছিলো জানো?

দীপু বললো -স্পীড লিমিটের একটু উপরে।

-একটু উপরে! আমার রাডার বলছে ৯৫ মাইল। স্পীড লিমিট ৬৫ মাইল।

-দেশ থেকে আমার বাবা আসছে। এয়ারপোর্টে যাচ্ছি, হাতে সময় বেশী নেই .... বাকীটুকু উহ্য রেখে দিলো দীপু।

অফিসার চোখ ছোট ছোট করে তাকালো-তাই বলে তুমি ৯৫ তে যাবে? করো কি তুমি?

কম্পিউটার কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করি ফিডেলিটি ইনভেস্টমেন্টে।

এদেশের ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানীগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে ফিডেলিটি। অফিসারের মন নরম হলো।

-এতো জোরে গাড়ী চালানো ঠিক নয়। খুব সহজ ভঙ্গিতে একটা টিকিট ধরিয়ে দিলো সে। দেড়'শ ডলার জরিমানা। মারহাবা। দীপু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে গাড়ী স্টার্ট দিলো। এমন যে হবে সে তো জানা কথা। আভা মানেই কুফা। কপালের লিখন খন্ডায় কে? দেড়শ ডলার পুরো গচ্চা। একেবারে স্পীড লিমিটে গাড়ী ধরে রাখলো

দীপু। দেরী হয় হোক। আবার ধরা খাওয়া যাবে না। একদিনে দু'বার ধরা খেলে কেলেংকারি।

JKF তে এটাই প্রথম বার। নিউইয়র্কে রাস্তার প্যাঁচে ঘাগু ড্রাইভারেরও দিশা হারিয়ে যায়, দীপু স্বাচ্ছন্দ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেললো। বায়ে ঘুরে, ডানে ঘুরে বার দুয়েক একই রাস্তায় এপাশ ওপাশ করে ডজন খানেক গ্যাস স্টেশনে থেমে পথের খোঁজ নিয়ে বিকেল পাঁচটার দিকে এয়ারপোর্টে পোঁছালো ও। আভা রক্ত চক্ষু মেলে মেইন গেটেই দাঁড়িয়ে ছিলো। দীপুকে দেখেই দাঁত কিড়মিড় করে ঘড়ি দেখলো সে।

দীপু শুকনো মুখে বললো-পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। এদিকে আগে কখনো আসিনি। তোমার লাগেজ কোথায়?

আভা অসম্ভব সুন্দরী। এতো সুন্দর না হলেও তার চলতো; কিন্তু দীপুর জীবনটাকে বারো ভাজা করবার জন্য এই অস্ত্রটির তার প্রয়োজন ছিলো। তার ধারালো চিবুক, কটা চোখ, টিকালো নাক এবং চমৎকার শারীরিক গঠন দেখলে অধিকাংশ যুবকের এটা সেটা ভুল হয়ে যায়। দীপুর প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন। অসম্ভব সুন্দর কিছু দেখলেই তার বুকের গভীরে কোথায় যেন বেদনার বীণা বেজে উঠে। আভাকে দেখেই সেই ব্যথাটা আবার শুরু হলো।

আভা মুখে কিছু বললো না। আঙুল দিয়ে দু'মনি দুটো বাক্স দেখিয়ে দিলো। দীপু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে দুটোকে গাড়ীর ট্রাঙ্কে ভরলো। আভা দু'কোমরে হাত রেখে বার তিনেক বলেছে-কি, হাত দিতে হবে নাকি?

দীপু গাড়ীতে স্টার্ট দিলো। আভা তার ববছাট চুলে বার দুয়েক পোঁচ দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। তার ঠোঁটে হালকা এক টুকরো হাসি। -খুব রেগে আছেন দেখি। কথাই বলা হচ্ছে না। রাগার তো কথা আমার। পাকা দু'ঘন্টা ফাও বসে আছি।

-অপরাধ হয়েছে, মাফ চাচ্ছি।

-মাফ চাইতে বলেছে কে? কোন পথে ফিরতে হবে জানা আছে তো? এই রাতে পথ ঘাট হারিয়ে বিপদে ফেলবেন না যেন।

-আরে না, পথ হারাবো কেন?

প্রথম বাঁকটাতেই সব গোলমাল করে ফেললো দীপু। বাঁয়ে ঘোরার কথা ছিলো, ডানে ঘুরলো ও। মিনিট খানেক পরে বুঝলো ভুল পথে যাচ্ছে। তার মুখ দেখেই আভা যা বোঝার বুঝে নিলো। বাহিরের আলোকিত রাস্তায় চোখ রেখে বিড়বিড়িয়ে উঠলো সে-আগের মতই গাধা আছেন?

-বাজে কথা বলো না। চুপচাপ বসে থাকো।

-এখন দেখি আবার আমার উপরে মেজাজ দেখানো হচ্ছে। আমার উপরে রাগ না দেখিয়ে পথ খোঁজেন।

-তা ছাড়া করছি কি? নাকে তেল লাগিয়ে ঘুমাচ্ছি?

-সব সময় এতো ঝগড়া করেন কেন?

-ঝগড়া তো তুমি করছো।

-বাহ্ বাহ্, এখন আবার আমাকে দোষ দেয়া হচ্ছে। এখানে বাঁয়ে মোড় নেন। সামনের সিগনালে বাঁয়ে ঘুরে আবার আগের রাস্তায় ফেরা যাবে।

দীপু দ্রুত বাঁক নিতে গিয়ে একটা ট্যাক্সির সাথে প্রায় মুখোমুখি লাগিয়ে দিয়েছিলো। প্যা প্যা করে চিৎকার করে উঠলো ট্যাক্সি। দীপুর মেজাজ পুরো খিঁচড়ে গেছে। বিড়বিড়িয়ে গাল দিলো ও - চোপ শালা বেতমিজ।

আভা নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো - দিতেন লাগিয়ে। বেশ মজা হতো।

দীপু সে কথার কোন জবাব দিলো না। এই ঝামেলা সামলানোর প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। আগে এই গোলক ধাঁধা থেকে বের হওয়া দরকার।

৩

আই 95 সাউথ (Interstate 95 South) নিলো দীপু। অফিস ফেরত ট্রাফিক। রাস্তায় ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁকা নেই। গাড়ী চলছে ঢিমে তালে, গরুর গাড়ীর মতো। দীপু ছ'টার দিকে ভুলেও হাইওয়েতে নামে না। ভীড়ভাট্টায় গাড়ী চালাতে তার জঘন্য লাগে। অতিরিক্ত সর্তক থাকতে হয়। সে গোমড়া মুখে চারপাশে আঠার মতো লেগে থাকা গাড়ীগুলোর উপর চোখ বোলায়।

আভা বিরক্ত কণ্ঠে বললো- কি ব্যাপার কথাবার্তা কিছু বলছেন না কেন?

-কিছু বলার নেই।

-কিছু বলার নেই মানে? এক বছর পরে দেখা হলো একটা ভালো মন্দ কিছু তো জিজ্ঞেস করতে পারেন। ফোন করলেও তো কথাই বলতে চান না। এতো রাগ কেন আপনার আমার উপরে?

-ফালতু কথা বলবে না।

-আমার সাথে এভাবে কথা বলবেন না। থাপ্পড় লাগিয়ে দেবো।

-মুখ বন্ধ করে বসে থাকো। তোমার জন্য দেড়'শ ডলার গচ্চা গেছে, মেজাজ খুব খারাপ।

-স্পীডিং এর জন্য টিকিট খেয়েছেন? বেশ হয়েছে। কেন, আমি আপনাকে স্পীডিং করতে বলেছিলাম? সবকিছুতে আমার দোষ! ভাবে গদ গদ হয়ে ইয়া লম্বা এক প্রেমের কবিতা লিখে আমার বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন আপনি, আর সবাইকে বলে বেড়ালেন এতে আমার ইন্ধন ছিলো! ভালোই পেয়েছেন আমাকে।

দীপুর মুখে অমাবস্যা ঘনিয়ে এলো। সেই পনেরো বছরের কেচ্ছা। একদিন নয়, দু'দিন নয়, বারো বছর আগে ঘটনা। সুযোগ পেলেই এখনো সেটা নিয়ে কথা শোনাতে ছাড়ে না। আশ্চর্য মেয়ে!

আভা ভ্রু কুঁচকে বললো-রাগ হয়ে গেলো নাকি? মিথ্যে তো কিছু বলিনি।

-বেশী বক্ বক করো না। পেনে উঠবার আগে আমার দেড়'শ ডলার ফেলে যাবে।

আভা দু'কাধে ঢেউ তুলো বললো-আহা, বায়না শুনে বাঁচি না।

আধঘন্টায় দু'মাইল পথ এগিয়েছে দীপু। আশা করছে ট্রাফিক কমে যেতে শুরু করবে। প্রচুর গাড়ী এক্সিট (exit) নিচ্ছে।

আভা আদুরে গলায় বললো -আমাকে বোষ্টন দেখাতে হবে কিন্তু। আগে কখনো আসিনি।

-পৌঁছাতে রাত দশটা বাজবে, তখন কিভাবে বোষ্টন দেখাবো? তোমার ফ্লাইট ক'টায়? পথ ঠেঙিয়ে গিয়ে লাভ কি? ক'ঘন্টা পরেই তো আবার ফিরতে হবে।

-ওসব নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

-মাথা ঘামাচ্ছি কে বললো! ফাউ ফাউ এতো ড্রাইভ আমার ভালো লাগে না।

-নিজের এলাকায় পেয়ে খুব অপমান করে নিচ্ছেন?

-তোমার কানেকটিং ফ্লাইট কখন?

-তা দিয়ে আপনার কি?

রাস্তা অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। গাড়ীর গতি বাড়িয়ে ৭০ মাইলে নিয়ে এলো দীপু। আভা বাঁকা গলায় বললো-আবার একটা টিকিট খাবার সখ হয়েছে। স্পীড লিমিট ৫৫, উনি মহারাজার মতো ৭০-এ চলেছেন। ধরে প্যাদানী দেয়া দরকার।

-টিকেট খেলে আমি খাবো। তোমার কি? মুখ বন্ধ করে বাইরের দৃশ্য দেখো।

-এই অন্ধকারে বাইরের দৃশ্য কি দেখবো? তার চেয়ে দু'জন সুস্থ মানুষের মতো গল্প করি, আসুন। অনেক ঝগড়া হয়েছে।

-অর্থাৎ আমি অসুস্থ?

-সে তো আর নতুন কিছু নয়!

দীপু বিড়বিড়িয়ে বললো - তোমাকে নিতে আসাই আমার উচিত হয়নি। থাকতে বারো ঘন্টা এয়ারপোর্টে বসে।

আভা দু'হাতে চুল ঝাঁকিয়ে বললো- আপনাকে মিথ্যে বলেছিলাম। আমার ফ্লাইটের এখনো ছ'দিন বাকী।

-মিথ্যে বললে কেন?

-মিথ্যে না বলে উপায় কি? ছ'দিনের কথা শুনলেই তো ভিমড়ী খেতেন।

দীপু বিরক্ত কণ্ঠে বললো- এসব কি ধরনের ফাজলামী? ছ'দিন আগে তোমার এখানে আসবার দরকারটা কি? আমার এপার্টমেন্টে আমি একাকী থাকি। তুমি সেখানে কিভাবে থাকবে? মানুষের যদি একটা কান্ডজ্ঞান থাকে।

-কান্ডজ্ঞানের প্রশ্ন উঠছে কেন? থাকবো আপনার বাসায়। কেন, একা পেয়ে কিছু করে ফেলবেন নাকি?

-উদ্ভট কথাবার্তা বলবে না। শরীর জ্বলতে থাকে।

-এ বাবা! আবার শরীর নিয়ে কথা বলছেন কেন? এখন তো ভয়ই ধরিয়ে দিলেন।

দীপুর কথা চালিয়ে যাবার আগ্রহ পুরোপুরি উবে গেলো। সে ভয়ানক জোরে গান চালিয়ে দিলো। আভা নির্দ্বিধায় সিডি পেয়ার (CD Player) বন্ধ করে দিলো।

-গান শুনতে হবে না। আমার সাথে কথা বলেন।

-বললাম তো একবার, কথা বলার কিছু নেই।

আভা সেটা গায়ে মাখলো না - দেশে কেন যাচ্ছি সেটা তো জানতে চাইলেন না।

-জানার ইচ্ছে নেই।

-শুধু বাজে কথা। বুক ফেটে যাচ্ছে জানার জন্য।

-বলেছে তোমাকে !

-ঠিক করে বলেন। জানতে ইচ্ছে হচ্ছে না?

-বিন্দুমাত্র না।

আভা বেশ আয়েশী ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে বসলো। দীপুর মুখের উপর দৃষ্টি রেখে বললো - বিয়ে করতে যাচ্ছি।

-কেউ জানতে চায়নি।

-সত্যি সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছি। বয়সও তো কম হলো না। চব্বিশ। এই বয়সে অনেক মেয়ের এক ঝাঁক বাচ্চাকাচ্চা থাকে। চিন্তা করা যায়। কি হলো, কিছু বলছেন না কেন?

-কি বলবো?

-কিছু একটা বলুন। আপনি কবে বিয়ে করছেন? আপনারও তো বয়স কম হলো না।

-ওসব নিয়ে আপাতত ভাবছি না। কিছু দিন চাকরী-বাকরী করি, তারপর দেখা যাবে।

-এখানে কিছু জুটিয়ে ফেলেন নি তো? নাহ্, সেটা সম্ভব নয়। আপনার মত গোবর্ধনের সাথে যেঁচে কে প্রেম করবে।

-আমার সম্বন্ধে তোমাকে কেউ থিসিস লিখতে বলেনি। দীপু আবার গান চালিয়ে দিলো।

আভা ঠোঁট টিপে হাসলো। গাড়ীর ভেতরটা বেশ গরম হয়ে আছে। হিটিং হাই (high) এ দিয়ে রাখা। সে জানালাটা সামান্য নামিয়ে দিলো। ছুরির মতো অসম্ভব ঠান্ডা বাতাস ছুটে এলো নিমেষে।

দীপু বিরক্ত হয়ে বললো - এই ঠান্ডার মধ্যে আবার জানালা খুললে কেন? গরম লাগলে হিটিং কমিয়ে দিচ্ছি।

-না, এই বাতাসটাই ভালো লাগছে। কেন, ঠান্ডা লাগছে আপনার?

-হ্যাঁ।

বাতাসে এলোমেলো হয়ে গেল চুল। সেগুলোকে ঠিক করবার চেষ্টা করতে করতে আভা বললো - আমার বিয়ের অবশ্য এখনো কিছু ঠিক হয় নি। বাবা কিছু ছেলে

দেখে রেখেছেন। একজন মন্ত্রীর ছেলেও আছে সেই দলে। খুব নাকি লম্বা-চওড়া। আপনার হাইট কতো? পাঁচ-আট .. নয়?

দীপু নিস্পৃহ গলায় বললো -জানালাটা বন্ধ করে দাও। ঠান্ডা লাগছে।

আভা সে কথায় কান দিলো না। -এই ছেলেটি ছ’ফুটের কাছাকাছি। লম্বা ছেলেদের আমার খুব পছন্দ।

-এসব আমাকে বলছো কেন? তোমার কোন বান্ধবী-টান্ধবী নেই?

-কেন আপনার হিংসে হচ্ছে?

-জানালাটা বন্ধ করে দাও।

-জনকে আপনি দেখেছেন? গত বছর যখন ডালাসে গেলেন ছোট খালার বিয়েবার্ষিকীতে তখনই তো দেখা হয়েছিলো। ওকে মনে আছে আপনার? হোয়াইট ছেলে, ছ’ ফুট দু’য়ের মতো। ওর সাথে ডেটিং এ যাবার জন্য আমার পা ধরতে শুধু বাকী রেখেছিলো। শেষে রাজী হয়ে গেলাম। ৪-৫ মাস ডেটিং করেছি ওর সাথে। কিন্তু টিকলো না। তবে ছেলেটার জন্য আমার ভীষণ ফিলিংস।

-এসব প্রেমের কেচ্ছা আমাকে শোনাচ্ছো কেন? জানালাটা বন্ধ কর এবার।

-আপনার এতো অহংকার কেন বলেন তো?

-তুমি আমার সর্দি লাগিয়ে ছাড়বে।

-ভালো ছাত্র ছিলেন, লেখালেখি করেন, এটা ভালো কথা। কিন্তু সেই জন্যে এতো অহংকার থাকাটা ভালো নয়।

-কি আজে-বাজে কথা বলছো? আমার কোন অহংকার নেই।

আভা জানালাটা লাগিয়ে দিলো। গুড়ি গুড়ি তুষার পড়তে শুরু করেছে। হেডলাইটের আলোয় ঝাঁক বেঁধে নেমে আসা তুষারের ক্ষুদ্র স্ফটিকগুলো আলোয় চিকচিকিয়ে উঠছে। চমৎকার দৃশ্য। সে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললো - স্নো (Snow) দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। আপনার?

-অসম্ভব ভালো লাগে। বিশেষ করে যখন মুষল ধারে শুরু হয়। অবশ্য স্নো-র মধ্যে গাড়ী চালাতে জঘন্য লাগে।

আভা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তুষার পড়া দেখলো। -জনের সাথে কেন ছাড়াছাড়ি হলো শুনবেন না?

-আমার এসব শুনবার দরকার কি? এসব তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আভা আহত কণ্ঠে বললো- মাঝে মাঝে এমন অপরিচিতের মতো কথা বলেন।

-আচ্ছা বলো, কেন জনের সাথে তোমার ছাড়াছাড়ি হলো?

-না থাক। আপনার আসলে জানবার ইচ্ছে নেই।

-বলতে না চাইলে বলো না।

-একশ’বার বলবো। জন আমাকে বিছানায় নেবার খুব চেষ্টা করেছিলো। আমি রাজী হইনি। সুতরাং অন্য মেয়ের পেছনে ছুটতে শুরু করলো ও।

-এতই যদি ফিলিংস, তাহলে ওটাতেই বা বাধা ছিলো কি?

আভা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীপুকে পর্যবেক্ষণ করলো - এভাবে কথা বলছেন কেন আপনি? আপনার কি ধারণা আমি ঐ ধরণের মেয়ে?

-এই আলাপে জড়ানোর কোন ইচ্ছা আমার নেই।

আভা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো- বাজে কথা বলে চেপে যাবার চেষ্টা করবেন না। ওদের সাথে মিশি বলেই যে ওদের মতো হয়ে গেছি এমন ভাবতে পারলেন কি করে আপনি?

-এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ছো কেন? আমি খারাপ কিছুই বলিনি। ওদের কাছে বিয়ের আগে সেক্স স্বাভাবিক বস্তু। অনেকেই তো দেশ থেকে এসে বেশ খাপ খাইয়ে নেয়।

-তাহলে আপনার ধারণা ছিলো আমি এদেশী ছেলেদের সাথে শুয়ে বেড়াচ্ছি? ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেই কেউ বিছানায় চলে যায় না। আপনার এমন ছোট মন! এই জন্যেই কারো সাথে মিশতে পারেন না। চার বছর এদেশে আছেন বন্ধুর সংখ্যা হাতে গোনা যায়।

দীপুকে চুপ করে থাকতে দেখে আভা রুক্ষ কণ্ঠে বললো - কি হলো চুপ করে আছেন কেন?

-এই বিষয়টা থাক। তোমার ব্যক্তিগত কথাবার্তা আমাকে বলার দরকার নেই।

আভা চাঁপা গলায় বললো-হারামী!

দীপু গানের জোর আরেকটু বাড়িয়ে দিলো। সবেমাত্র 84 ইষ্ট-এ ঢুকেছে ও। এখনো দেড় ঘন্টার পথ। আবার কথাবার্তা শুরু হলে রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে ঝগড়া করবার অবস্থা হবে।

৪

তুষারের বেগ বাড়ছে। রাস্তায় ইতিমধ্যেই বেশ পুরু স্তর জমে গেছে। দু'টি লবণ ছিটানো ট্রাককে পাশ কাটিয়ে গেলো দীপু। স্পীডোমিটারের কাঁটা ৭০ মাইলে। দৃষ্টিশক্তি কিছুটা অস্বচ্ছ হয়ে এলেও অবস্থা এখনো নিতান্ত মন্দ পর্যায়ে নয়। বেশ কিছু গাড়ীকে ভোস্ করে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখলো ও। কম করে হলেও ৮০ মাইলের উপরে চালাচ্ছে। এই আবহাওয়ায় সেটা খুব বিচক্ষণতার কাজ নয়। রাস্তা কোথায় পিচ্ছিল হয়ে আছে বোঝার কোন উপায় নেই। একবার নিয়ন্ত্রণ হারালে লুটোপুটি খেয়ে গাড়ী কোথায় পড়বে তার কোন ঠিক নেই। এক্সিডেন্টের রেট অসম্ভব বেশী, তারপরও অধিকাংশ মানুষই বিশেষ তোয়াক্কা করে না।

দীপু ফুল স্পীডে ওয়াইপার চালিয়ে দিলো। তারপরও তুষার জমে যাচ্ছে উইন্ডশীল্ডে। আভা কটুক্তি করলো-স্পীডটা একটু কমালে হতো না? এই রকম একটা অকম্মার সাথে এক যাত্রায় মরবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার।

-বাজে কথা বলবে না। স্পীড কমিয়ে দিলো দীপু। না কমিয়ে উপায়ও ছিলো না। এদিকটাতে মনে হয় দীর্ঘক্ষণ তুষার পড়ছে, রাস্তায় এবড়ো থেবড়ো হয়ে তুষারের স্তুপ পড়ে গেছে। কোথাও কোথাও তুষার জমে বরফ হয়ে গেছে। চাকার নীচে দাঁত কিড়মিড় করে উঠছে তারা। বরফটাই বিপদজনক। গাড়ীর লম্বা লাইন পড়ে গেছে। ট্রাফিক চলছে খুব ধীরে, সাবধানে।

আভা বললো-আজকে এমন ভয়ানক ্র পড়বে সেটা আগেই আমাকে জানানো উচিৎ ছিলো। তাহলে নিউইয়র্কে পাভেল ভাইয়ের বাসায় রাতটা কাটিয়ে দেয়া যেতো।

-আমি কি করে জানবো!

-কি করে জানবেন মানে? এতো কাড়ি কাড়ি ওয়েদার ফোরকাষ্ট (Weather forecast) কি এরা কাক-পক্ষীকে শোনানোর জন্য করে?

দীপু চুপ করে থাকলো। আবহাওয়া নিয়ে সে কখনই বিশেষ মাথা ঘামায় না। একটু আধটু তুষারে কি আসে যায়?

আভা বিরক্ত কণ্ঠে বললো -কি কথা বলছেন না কেন?

-এমন ধমক দিয়ে কথা বলছো কেন? এ কি আমি তৈরী করছি নাকি?

-আমার ক্ষিধা লেগেছে। সামনে ফুড এক্সিট এলে গাড়ী থামিয়ে ফেলবেন।

আপাতত হাইওয়ে ছেড়ে নড়বার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই দীপুর। লোকাল রাস্তায় এতক্ষণে নিশ্চয় তিনহাত তুষার নেমে গেছে। সিটি কর্পোরেশন তুষার পরিষ্কার করতে তিনদিন লাগিয়ে দেয়।

ধবধবে তুষারে ঢেকে থাকা একটি অসম্ভব বাঁকানো চিকণ এক্সিট দেখেও না দেখার ভান করে কাটিয়ে গেলো দীপু। আভা চোখ কুঁচকে বললো-এই এক্সিট- এ একটা ম্যাকডোনাল্ডস্ (Macdonald's) ছিলো।

-তাই নাকি? খেয়ালই করিনি।

আভা তার পিঠে অসম্ভব জোরে একটি চিমটি কাটলো। -এতো ঢং শিখেছেন কোথায়?

দীপু হেসে ফেললো। -ঘন্টা খানেকের মধ্যেই বাসায় পৌঁছে যাবো। এখন যেখানে সেখানে নেমে সময় নষ্ট করবার দরকারটা কি?

-আপনার বাসা এখান থেকে আর কত পথ?

-বেশী না।

-কত মাইল তাই বলুন।

-৭০ মাইলের মতো।

-এই অবস্থায় ৭০ মাইল আপনি এক ঘন্টায় যাবার স্বপ্ন দেখছেন। আমাকে পাগল পেয়েছেন নাকি?

দীপু চুপ করে থাকলো। গাড়ীর দীর্ঘ ক্যারাভানটি চলছে খুব শথ গতিতে, স্পীডো মিটারের কাঁটা ২৫ এর ঘরে স্থির হয়ে আছে।

আভা মসৃণ চুলের ঝাঁক কাঁধ বদলে বললো-এমন ক্ষিধে লেগেছে যে আপনাকেই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

-উত্তম প্রস্তাব। কোত্থেকে শুরু করবে?

দীপুর মাথায় চটাস করে একটি থাপ্পড় পড়লো-এমন একটা বাজে ইঙ্গিত দিতে আপনার লজ্জা করলো না? খুব যে এদেশী ছেলেদের দোষ দিচ্ছিলেন!

-আমি খারাপ কিছু বোঝাই নি।

-না! সাধু পুরুষ। থাপড়িয়ে সব কটা দাঁত খুলে ফেলবো।

দীপু বিশেষ আপত্তি করলো না এই প্রস্তাবে। আপত্তি করাটাই বিপদজনক। সে খুব মনোযোগ দিয়ে গাড়ী চালাতে লাগলো। আভা বললো -পিংকি আপাও তো এদিকেই থাকে। ঠিক না?

দীপুর ছোট বোন। দু'বছর হলো এদেশে এসেছে। হৃদয়ঘটিত একটা ব্যাপার ছিলো তার। টেলিফোনে বিয়ে পড়ে পেনে চড়েছিলো সে। অসম্ভব পরিশ্রম করেছে

এদেশে এসে। কাজ করেছে, স্কুলে গেছে। ফিনান্সে মাষ্টার্স শেষ করে এখন চাকরী খুঁজছে সে। তার ব্যক্তিগত অপছন্দের তালিকায় এক নম্বরে আভা।

দীপু ছোট করে বললো-হ্যাঁ।

-কোথায়?

-ওয়েস্ট হেভেন, কানেকটিকাট।

-এখান থেকে কত দূরে?

-৪০-৪৫ মাইল হবে।

-চলেন ওর বাসাতেই যাই।

-ওয়েস্ট হেভেন আমরা পেছনে ফেলে এসেছি।

-তাতে কি? গাড়ী ঘোরান।

-ঠাট্টা করছো?

আভা তার অসম্ভব গম্ভীর মুখখানা দীপুর মুখের সাথে প্রায় সেঁটে দিয়ে বললো-ঠাট্টা করছি মনে হচ্ছে?

দীপু প্রমাদ গুণলো। আভার মুখে সে অশনি সংকেত দেখেছে-কোথাও নেমে বরং খেয়ে দেয়ে নেই।

-না। ওকে অনেকদিন দেখিনা। ওর বাসাতেই চলেন। সামনের এক্সিট নেন।

-কোন খবর টবর না দিয়ে হঠাৎ করে এভাবে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

-খবর দেবার কি আছে! আমরা ছোট বেলার বান্ধবী।

দীপু এক্সিট নিলো। এই মেয়েকে বেশী ক্ষেপানোর কোন ইচ্ছা তার নেই। মাইল খানেক আধফুট তুষারের স্তর পেরিয়ে 84 ওয়েষ্ট এ নামলো ও।

কাজটা বিশেষ উচিৎ হচ্ছে না। পিংকি আভাকে দেখলেই মুখ ব্যাজার করে ফেলবে। কিন্তু এই মেয়েকে একা সামলানো দীপুর কাজ নয়।

তুষারের বেগ সামান্য কমেছে। রাস্তার অবস্থা অবশ্য শোচনীয়। ধীরেই চালাতে হচ্ছে দীপুকে। আভা বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো-আপনার সাথে একাকী এক বাসায় রাত কাটাবো এমন পাগল আমি নই।

দীপুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো।

-একদম বাজে কথা বলবে না।

আভা বিড়বিড়িয়ে উঠলো-বদমায়েশের বদমায়েশ।

আভাকে দেখে পিংকি বাস্তব অর্থে হা হয়ে গেলো।

-তুমি এখানে কি করছো?

-তোমাকে দেখতে এলাম পিংকি আপা। কম করে হলেও তিন বছর দেখা হয়নি। তোমার বর কোথায়?

পিংকি সেই আলাপের কাছ দিয়েও গেলো না। সে ভ্রু কুঁচকে দীপুর দিকে ফিরলো-তোমার সাথে ওর কোথায় দেখা হলো?

-এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম রিসিভ করতে। দেশে যাচ্ছে ও।

-পাভেল ভাই থাকতে তুমি কেন?

আভা পিংকির বিরক্তি গায়ে মাখলো না। সে নিরীহ গলায় বললো-তোমাদের সবাইকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিলো, পিংকি আপা। হঠাৎ এভাবে এসে তোমাকে কোন অসুবিধায় ফেললাম না তো?

পিংকি মুখ ব্যাজার করে বললো-না, অসুবিধা আর কি! এসে ভালোই করেছো।

দীপু বললো-সামি কোথায়?

-ঘুমাচ্ছে। বিকেল থেকেই প্রচন্ড মাথা ধরেছে ওর। কাজ ফেলে চলে এসেছে। ক'দিন পর পরই এ সমস্যা। ডাক্তার দেখানো দরকার।

-যখনই এই অবস্থা হয় তখনই ডাক্তার দেখাতে চাস। একদিন ধরে বেঁধে নিয়ে যাস না কেন?

-নেবো বললেই নেয়া যায় না। গ্যাস স্টেশনে কাজ করে, ওর কি মেডিকেল ইন্সুরেন্স আছে? ডাক্তারের মুখ দেখলেই ষাট ডলার খসে যাবে। ওসব আলাপ থাক। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে ও। বসো তোমরা।

পিংকির লিভিংরুম অসম্ভব গোছালো। দু'টি সোফা সেট, টিভি, ভিসিআর, কম্পিউটার, শো-কেস সব কিছু টিপটপ করে সাজানো। আভা অবাক হয়ে বললো-বাহ্, তুমি তো মাত্র ক'দিনেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছো।

-ঘর সংসার করছি। এসব না থাকলে চলবে কেন? তুমি কবে বিয়ে করছো?

-বাবা-মা ছেলে দেখছেন। দেখি, কাউকে মনে ধরে গেলে এবারই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবো।

-ভালো। তোমাকে নিয়ে সবার খুব চিন্তা।

আভা হেসে উঠলো। -আমি তো বরাবরই এই রকম। কিন্তু এখন পর্যন্ত কাউকে কোন সমস্যায় ফেলেছি বলে তো মনে পড়ে না।

পিংকি এই প্রসংগে কথা বাড়ালো না। আভার প্রতি দীপুর আগ্রহের পরিমাণ সে জানে। তার ধারণা মেয়েটি দীপুকে অকারণে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। দীপুর যদি কোন কান্ডজ্ঞান থাকে। সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। লিভিংরুম সংলগ্ন কিচেন। মাঝখানে একটি দেয়াল, দু'পাশ ফাঁকা। এদেশে পৃথক রান্নাঘরের ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। পিংকি দ্রুত ফ্রিজের ভেতরে চোখ বোলালো। তারা দু'জন মাত্র মানুষ, ছুটির দিনে রান্না করে সারা সপ্তাহ খায়। বৃহস্পতিবার রাতে খুব বেশী অবশিষ্ট না থাকারই কথা। সে ডিপ ফ্রিজ থেকে বিশাল একটি চিংড়ীর প্যাকেট

বের করলো। দীপু বললো-আমার জন্য রান্না করিস না। আমাকে বাসায় ফিরতে হবে।

আভা দু'চোখ পাকিয়ে ফেললো-ফাজলামী হচ্ছে?

-বাজে কথা বলবে না। কাল আমার অফিস আছে। ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই।

-বলে দিন আপনার জ্বর-টর কিছু একটা হয়েছে। আমার অফিসে তো আমি সপ্তাহে দু'দিন করে ফ্লু'র অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নেই।

-এটা তোমার অফিস না। কাল সকালে আমাকে না দেখলে পিটিয়ে তক্তা বানাবে বস্ ।

আভা গম্ভীর মুখে বললো -তাহলে আমিও আপনার সাথে যাবো।

পিংকি অসম্ভব বিরক্ত হলো। -ভাইয়া একাকী থাকে। তুমি ওর সাথে গিয়ে কি করবে? আমার এখানে থাকো। আমি আর সামি গিয়ে তোমাকে পেনে তুলে দিয়ে আসবো।

আভা দীপুকে লক্ষ্য করে দাঁত কিড়মিড় করলো। গলা নামিয়ে বললো -সাহস থাকলে যান!

এই জাতীয় সংলাপে আতংকিত হবার যথার্থ কারণ আছে দীপুর। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সে শিখেছে এই জাতীয় পরিস্থিতিতে অসম্ভব সব কাজ করে ফেলতে পারে আভা। মিশিগানে থাকতে এমন একটি অভিজ্ঞতা তার হয়েছিলো। সে পড়ছিলো ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে, আভা ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানে (U. Mass)। মাইল পঞ্চাশের ফারাক। দু'জনার মধ্যে যোগাযোগ না থাকাটাই অস্বাভাবিক হতো। জন্মদিনের দাওয়াত পেয়েছিলো দীপু। যাওয়ার ইচ্ছে হয় নি। জানাই ছিলো সেখানে কি হবে। অসম্ভব জোরে মিউজিক বাজবে, দলবেঁধে ছেলেমেয়েরা নাচানাচি করবে, অল্পবিস্তর এলকোহলিক বিভারেজ থাকার সম্ভাবনাও বেশী। দীপুর কাছে বরাবরই এসব বাড়াবাড়ি মনে হয়। সে না যাবারই সিদ্ধান্ত নিলো। রাত দশটার দিকে পর পর বারোটি গাড়ী তার এপার্টমেন্টের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলো। কম করে হলেও চলিশজন ছেলেমেয়ে সুড় সুড় করে ঢুকে পড়লো তার দু'বেডরুমের এপার্টমেন্টে। দীপুর ভারতীয় রুমমেটরা দু'চোখ কপালে তুলে ফেললো। বিশাল একটি স্টেরিওসেট ঢুকে পড়লো দরজা খুলে। শুরু হলো ধুম্ ধাম্, ধুম্ ধাম্। আভা দীপুর কানে মুখ ঠেকিয়ে বললো -সবাই জানে আপনি আমার বয় ফ্রেন্ড। আপনাকে ছাড়া আমার জন্মদিন হয় কি করে?

সেই পঙ্গপালের দল ঝেটিয়ে দূর করতে ঘন্টা দুয়েক লেগেছিলো দীপুর। পরদিনই এপার্টমেন্ট কমপেক্সের ম্যানেজমেন্ট বিশাল এক কসান লেটার (caution letter) দরজায় ঝুলিয়ে দিয়ে গেলো। "এই সব চন্ডালীপনা বরদাস্ত করা হবে না।" হেনস্থার একশেষ।

পিংকি বললো - ভাইয়া, অফিসে সমস্যা হলে চলে যাও। আভা আমার এখানে থাকবে।

আভা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। দীপু বিপদে পড়ে গেলো। সে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বিড়বিড়িয়ে বললো - রাস্তার অবস্থা অবশ্য খুবই খারাপ। এখনও সমানে ͏ পড়ছে। বরং দেখি আরো কয়েক ঘন্টা। আবহাওয়া ভালো হয়ে গেলে যেতে হবে।

আভা মেজাজী কণ্ঠে বললো - আচ্ছা সে দেখা যাবে।

পিংকি বুঝলো তার ভাই আজ রাতে আর কানেকটিকাট ছেড়ে নড়ছে না। এতোবার হেনস্থা হয়েও যার আক্কেল হয় না, তাকে আর কি বলার থাকে। সে রান্না চাপিয়ে দিয়ে সামির খোঁজ নিতে গেলো। সামির ঘুম ভেঙেছে। সে জড়ানো গলায় বললো - কারা এসেছে?

-ভাইয়া। আভাটাও কোত্থেকে এসে জুটেছে তার সাথে। লাজ-লজ্জা বলে কিছু নেই মেয়েটার।

সামি এক লাফে বিছানা ছাড়লো। -বলো কি? আমার বাসায় এই প্রথম কোন শালীর পদার্পণ!

-শালীর কথা শুনেই মাথাব্যথা সেরে গেলো?

সামি হেসে ফেললো - মাথাব্যথা বেশ আগেই সেরেছে। চুপচাপ শুয়ে ছিলাম।

লিভিংরুমে ঢুকেই সে বেশ একটি নাটক করে ফেললো।

-আরে আভা, কেমন আছো? তোমার কথা কত শুনেছি! আমাদেরকে আগে খবর দাও নি কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সামির সাথে দীপুর বেশ কিছু চোখে পড়ার মত পার্থক্য আছে। সামি দিলখোলা টাইপের। অসম্ভব মিশুক। চমৎকার কথাবার্তা বলে। আমেরিকা এসে পড়াশুনা করাটা হয়ে ওঠেনি। অসম্ভব খরচের ব্যাপার। নিউইয়র্কে কাটিয়েছে তিন বছর। কাজ করেছে সম্ভব অসম্ভব প্রতিটি জায়গায়। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছিলো একটি ফাস্ট ফুড রেষ্টুরেন্টের ম্যানেজিং পদে। টাকাপয়সা ভালোই পেতো। কিন্তু পিংকির এডমিশন হলো ইউনিভার্সিটি অব নিউ হেভেনে। সুতরাং পাততাড়ি গুটিয়ে এখানে চলে এসেছে ও। একটি গ্যাস স্টেশনের ম্যানেজার। যা পায় তাতে দুজনার সংসার ভালোই চলে যায়। দীপুর ইচ্ছা আছে বোনের পড়াশোনার একটা গতি হলেই এই ছোঁড়াকে স্কুলে পাঠাবে সে। ছোঁড়া এমনিতে অসম্ভব স্মার্ট হলেও লেখাপড়ায় গাধার গাধা। স্কুলে গিয়ে আদু ভাইয়ের মতো আটকে যায় কিনা সেটাও চিন্তার বিষয়।

সামির সাথে বেশ জমে গেলো আভার। পিংকি ভাইকে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে এলো। -তুমি আবার এই মেয়ের পেছনে ঘুরছো? লজ্জা-টজ্জা বলে কিছু নেই তোমার?

-কি যা তা বলিস! আমার কি দোষ? আমাকে বলেছিলো কানেংটিং ফ্লাইটের কথা। কিন্তু আসলে ওর ফ্লাইট ছ'দিন পরে। হাজার হোক আত্নীয়, ফেলবো কি করে?

-না, তা ফেলবে কি করে? আভা শুনলেই তো অজ্ঞান। খবরদার ওকে তোমার বাসায় নিয়ে যাবে না। দেশে তোমার বিয়ের ঠিকঠাক হচ্ছে। এই সব কথাবার্তা কারো কানে গেলে খারাপ হবে।

-জেদ ধরলে কি করবো?

পিংকি একটু চিন্তা করে বললো -তুমি বরং কালকের দিনটা ছুটিই নাও। আমরা সামির বন্ধুর ছেলের জন্মদিনে যাচ্ছি কালকে। সেলসবারিতে। ওখান থেকে সবাই মিলে তোমার বাসায় চলে যাবো। উইক এন্ড কাটিয়ে ফিরবার সময় আভাকে সাথে নিয়ে চলে আসবো। এই মেয়েকে একদম লাই দিও না।

বোনের উপরে অগাধ বিশ্বাস দীপুর। সে তার বসের অফিসে ফোন করে একটি সুদীর্ঘ মেসেজ রেখে দিলো। নিউইয়র্ক থেকে ফিরবার পথে তার গাড়ীর কিছু সমস্যা হয়েছে। আপাতত একটি হোটেলে আছে সে। আগামীকাল অফিসে

আসাটা সম্ভব হবে কিনা বুঝতে পারছে না। রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়। ইত্যাদি।

সন্দেহ নেই বুড়ী মেসেজ শুনেই মুখ বাঁকাবে। ডালাস থেকে একটি মেয়ে এলো আর ওনার গাড়ীও খারাপ হলো, ফলে তাদেরকে হোটেলে উঠতে হলো। গাধা পেয়েছে আমাকে?

মন্দের ভালো এই যে হাতের কাজ সোমবারের আগে শেষ করলেই চলবে। সমস্যা কিছু হবার কথা নয়। কিন্তু দীপু ফিডেলিটি'র ডাইরেক্ট এমপয়ি নয়। সে কাজ করে কম্পিউটার হোরাইজন নামে একটি কন্সাল্টিং কোম্পানীর (Consulting Company) হয়ে। এই কোম্পানীটি আবার তাকে ধার করেছে মিনার্ভার কাছ থেকে। মিনার্ভা হচ্ছে দীপুর মাদার কোম্পানী। মিনার্ভার অফিসে ফোন করেও একটি মেসেজ রাখতে হলো তাকে। -বেশ জ্বর জ্বর ভাব। আগামীকাল অফিসে যেতে পারবে না।

বছরে তিন দিন সিক লিভ (Sick leave) পায় সে। আগামীকাল সেটার উপর দিয়েই চলে যাবে। পে চেকটা আসে মিনার্ভা থেকে। আগে থেকে না জানালে সমস্যা করে ছাড়বে তারা।

মাত্র ঘন্টাখানেকের মধ্যে বিশাল আয়োজন করে ফেললো পিংকী। এদেশী খাবারে বিশেষ রুচি নেই দীপুর। ফলে সুযোগ পেলেই বোনের এখানে চলে আসে সে। ঝাল বস্তুটি আভার বিশেষ পছন্দ নয়। সে নাকের জল চোখের জল এক করে ফেললো। তাই নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি হলো।

খাবার পর তিন দান স্ক্র্যাবল্ (SCRABBLE) খেলা হলো। সামি তিনবারই অম্লান বদনে জিতে গিয়ে মহা হুলস্থুল ফেলে দিলো। পিংকি নাক মুখ কুঁচকে কটুক্তি করলো -জঘন্য খেলা। একটা মূর্খ পর পর তিনবার জিতে যায়। ছি ছি!

রাত দেড়টার দিকে ঘুমের আয়োজন শুরু হলো। আভা দীপুর সাথে লিভিংরুমে ঘুমানোর প্রস্তাব দিতে তাকে মারতে যা বাকী রাখলো পিংকি। -এসব কি ধরণের কথাবার্তা? ভাইয়া আর সামি এ ঘরে শোবে, আমরা মেয়েরা ঐ ঘরে শোবো।'

আভা কিঞ্চিৎ ঠোঁটকাটা। সে বাঁকা গলায় বললো - কেউ শুনলে কিন্তু আমাদেরকে লেসবিয়ান বলবে।

-চোপ! এক ফোঁটা বদলাওনি তুমি।

দীপু এবং সামি সম্মিলিত কণ্ঠে হেসে উঠেছিলো; কিন্তু পিংকির অগ্নি দৃষ্টির সামনে তাদের নানান সাইজের দাঁতের ঝাঁক গা ঢাকা দিলো। পিংকি কঠিন বস্তু।

৬

পরদিন সকালে বেশ লম্বা প্যান করে বের হলো ওরা। গ্যাস স্টেশনে নেমে দু'চারটি কাজ সেরে নেবে সামি, সেখান থেকে ওরা যাবে ইস্ট রকে। কোথাও লাঞ্চ করে রওনা দেবে সেলস্বারির উদ্দেশ্যে। জন্মদিনের পার্টি বিকালে। সুতরাং হাতে যথেষ্ট সময় আছে।

চমৎকার সকাল। দিব্যি রোদ। বাতাসটা ঠান্ডা কিন্তু তারপরও আগের রাতের তুলনায় অনেক স্বস্তিকর। চারদিকে অবশ্য পুরু তুষারের আস্তরণ পড়ে গেছে। রোদের উত্তাপেও বিশেষ একটা কাজ হয়নি। সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীর ছাদে এখনও তিন ইঞ্চি তুষারের স্তুপ। গাছপালার শুভ্র বেশ। উজ্জ্বল রোদে ঝিকমিকিয়ে উঠেছে পরিবেশ। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।

পিংকি আভাকে তাদের গাড়ীতে তুলবার চেষ্টা করলো। দীপুর সাথে এক গাড়ীতে আভাকে তুলে দেবার ইচ্ছা তার আদৌ ছিলো না। কিন্তু আভা তার কথায় কান দিলো না। সে দীপুর ক্যামরিতে জাকিয়ে বসলো।

পিংকি বিরক্ত কণ্ঠে বললো। -ভাইয়ার মাথাটা চিবিয়ে না খেলে ওর চলছে না।

সামি বললো -দেখে তো মনে হয় ভাইয়ার প্রতি ওর বেশ টান আছে।

-টান আছে না ছাই। দু'দিন বাদে এসে একটু টান দিয়ে যায়। ও যখন স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে এলো তখনই ভাইয়ার সাথে ওর বিয়ের প্রস্তাব হয়েছিলো। পারিবারিক দিক দিয়ে কোন সমস্যা ছিলো না। এই মেয়েই মত দেয়নি। ওর ঢং দেখলে আমার শরীর জ্বলে।

সামি অবাক হয়ে বললো - এই কথা তো তুমি আমাকে কখনো বলনি!

-সব কথা তোমাকে বলতে হবে নাকি? এসব হচ্ছে ফ্যামিলি সিক্রেট।

-আমি ফ্যামিলির বাইরের লোক নাকি!

পিংকি ধমক দিলো -কোত্থেকে কি কথা উঠলো। চুপ করতো।

সামি গাড়ীতে স্টার্ট দিলো। গর্র্র করে উঠলো ইঞ্জিন। অসম্ভব ঠান্ডা হয়ে আছে। শীতকালে গাড়ী ভালোমতো গরম না করে সে রাস্তায় বের হয় না। দীপু অস্থির ভঙ্গীতে হর্ণ দিচ্ছে। বিন্দুমাত্র ধৈর্য নেই এই লোকটার।

সামির গ্যাস ষ্টেশন বাসা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। ওকে অনুসরণ করছে দীপু। প্রায় প্রতি সপ্তাহে বোনের বাসায় চলে আসে সে। সুতরাং এই এলাকা তারও মোটামুটি চেনা। তিনটি রাস্তার ঠিক সন্ধিস্থলে মবিল গ্যাস ষ্টেশনটি। ষ্টেশন সংলগ্ন অটোমোটিভ রিপেয়ারিং শপ। এই দু'টি ব্যবসা দিয়েই ফুলে ফেঁপে উঠছে সামির বস্। গ্যাস ষ্টেশনের কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই বাংলাদেশী। রাসু এবং আশিক ভাইকে পাওয়া গেলো। দু'জনই ডাক্তার। এদেশে এসে প্রচুর খেটেখুটে মেডিকেল সার্টিফিকেশন পরীক্ষা দিয়েছে তারা। এই পরীক্ষাটিতে অত্যন্ত ভালো স্কোর করাটা খুবই জরুরী। কারণ তার উপর নির্ভর করে হাসপাতালে রেসিডেন্সি পাওয়া। তারা দু'জনই রেসিডেন্সি পাবার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ।

আশিক ভাইয়ের সাথে দীপুর গলায় গলায় খাতির। তারা দু'জনই প্রচুর সিগ্রেট টানে, সুন্দরী মেয়ে দেখলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং ভালো খাবারের নাম শুনলেই জিভ বের করে ফেলে। সৌন্দর্যপিয়াসু মন নিয়ে ইদানিং একটু সমস্যায় আছেন আশিক ভাই। এলাকার ধুমপায়ী টিনএজার মেয়েগুলি সব এই ষ্টেশনে হানা দিয়ে থাকে। তাদের আই-ডি না দেখে সিগ্রেট বেচা বেআইনি। ধুমপানের নূন্যতম বয়স আঠারো। কিন্তু আশিক ভাই তাদের সুন্দর মুখগুলির দিকে তাকিয়ে না করতে পারেন না। সকাল বিকাল সামির হাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছেন তিনি সেজন্য। পুলিশ ধরতে পারলে তিনশ' ডলার জরিমানা। এই নিয়ে আশিক ভাইকে সকলেই কম বেশী ক্ষেপিয়ে থাকে। বেচারার বয়স ছত্রিশ, এখনও বিয়ে করাটা হয়ে ওঠেনি। তাকে দোষ দেয়া যায় না। অবশ্য তার ব্যক্তিগত অভিমত হলো - তের চৌদ্দ বছরের মেয়েরা ভুরি ভুরি বাচ্চা বিয়িয়ে বেড়াচ্ছে, তা নিয়ে সরকারের কোন মাথা

ব্যথা দেখি না। সিগ্রেট আর ড্রিংস নিয়ে এতো ধানাই পানাই কেন? আঠারো বছর না হলে ধুমপান চলবে না, একুশ বছর না হলে বারে ঢোকা যাবে না, এসব কি ধরনের মশকরা!

আশিক ভাইকে নিয়ে প্রচুর মজা হয়ে থাকে। তার সাম্প্রতিক প্রহসনের শিকার জেরাল্ড। শ্বেতাঙ্গ ছেলে, পনেরো ষোলো হবে বয়স। সামিকে ধরে গ্যাস স্টেশনে কাজ নিয়েছিলো সে। বিশাল দেহী ছেলে। আশিক ভাইয়ের ক্ষুদ্রাকৃতি অবয়ব দেখে সম্ভবত তার হাত নিশপিশ করতো। সুযোগ পেলেই ভদ্রলোকের কোমরে, পিঠে ছোট ছোট খোঁচা দিতো সে। মুখ বুঁজে কয়েকদিন সহ্য করলেন তিনি। শেষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো। তিনি জেরাল্ডকে এক নির্জন কোনায় টেনে নিয়ে গেলেন। - জেরাল্ড, তোমাকে একটা গোপন কথা বলবো। আমি হোমো সেক্সুয়াল। আমার বয়ফ্রেন্ড থাকে সান-ফ্রান্সিসকোতে। কম বয়সী ছেলেদের নিতম্ব আমার খুব পছন্দ। খবরদার, এই কথা যেন সামিকে বলো না। আমার চাকরী চলে যাবে।

জেরাল্ড পরদিনই কাজ ছেড়ে দিলো। এই ঘটনা শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো আভা। তাই দেখে বিশেষ রকম অনুপ্রানিত হয়ে পড়লেন আশিক ভাই। ভালো মন্দ নানান ধরনের জোক বলতে শুরু করলেন তিনি। দীপু বুঝলো, আভাকে আশিক ভাইয়ের পছন্দ হয়েছে। পরেরবার দেখা হলে আশিক ভাইকে এটি নিয়ে বেশ ক্ষেপানো যাবে। খুটিনাটি কাজ সারতে আধ ঘন্টার উপরে লেগে গেলো সামির। এই অবসরে বিনা মুল্যে বেশ কিছু কোক সাবাড় করে ফেললো দীপুরা।

ইষ্ট রক থেকে কাছেই ইয়েল ইউনিভার্সিটি। আমেরিকার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি। এখনও দেশজোড়া সুনাম তার। আভার অনুরোধেই ইয়েলের ক্যাম্পাসটা একবার চক্কর দিলো ওরা। এটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিলো শহর। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি অতিমাত্রায় জাগরিক। বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি। তার মাঝ দিয়েই ছুটে চলছে ব্যস্ত ট্রাফিক। এই জাতীয় পরিবেশ দীপুর আদৌ পছন্দ নয়। ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি ছিলো ঠিক এর বিপরীত। শহর থেকে কিছুটা দূরে নিজস্ব প্রাঙ্গন নিয়ে ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়টি। চার পাশে ঘিরে থাকা বনানী, বিশাল খেলার মাঠ, গল্‌ফ কোর্স, স্বচ্ছ পানির লেক এবং মায়াময় চেহারার হরিণের দল। সব মিলিয়ে সে যেন এক স্বর্গ। আভার অবশ্য ইয়েল খুবই পছন্দ হলো। দীপুর সাথে মানসিক পার্থক্য বেশ প্রকট।

বেশ দূর থেকেই চোখে পড়ে একটি স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টি, ইষ্ট রক। কম করে হলেও হাজার খানেক ফুট উঁচু। পাহাড় কেটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রশস্ত রাস্তা। সেই রাস্তা উঠে গেছে একদম চূড়ায়। চূড়াটি বেশ প্রশস্ত। প্রাচীন একটি লাইট হাউস দাঁড়িয়ে আছে কেন্দ্রে। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা পাহাড়ের কিনার।

আভা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। - কি অসম্ভব সুন্দর!

দীপুর হাত ধরে পাহাড়ের কিনারে টেনে নিয়ে এলো সে। বহু নীচে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ঘর-বাড়ী গুলোকে ছবির মতো মনে হয়। পাহাড়ের ঠিক ধার ঘেঁষে চওড়া লেক। গ্রীষ্মে প্রগাঢ় নীল রং থাকে তার, এখন বরফ সাদা। ঠান্ডায় লেকের পানি জমে গেছে। অসংখ্য রাস্তার সারি মাকড়শার জালের মতো ঘিরে আছে সম্পূর্ণ দৃশ্যটাকে। এবং দূরে, বহুদূরে আদিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্র!

দীপু যথেষ্ট অস্বঃস্তিবোধ করছে। আভা তার হাতখানি বেশ শক্ত করে ধরে আছে। দাঁড়িয়েছেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে। তার মসৃণ কালো চুল দীপুর গাল ছুঁয়ে আছে। পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ ঝাপটা দিচ্ছে নাকে। আড়চোখে পেছনটা দেখে নিলো

দীপু। পিংকি এবং সামি একটু পিছিয়ে পড়েছিলো। দৃশ্যটা তাদের দু'জনারই চোখে পড়েছে। পনেরো গজ দূর থেকেও পিংকির মুখের প্রগাঢ় ছায়া নজর এড়ালো না ওর। আভাকে আদৌ বিব্রত মনে হচ্ছে না। সে রেলিঙের উপর ঝুঁকে পড়ে উত্তেজিত গলায় বললো - দীপু ভাই, দেখে মনে হচ্ছে সাগরটা যেন আকাশের গায়ে ঝুলে আছে? তাই না?

দীপু খুক্ খুক্ করে কাশলো। - আভা, তুমি আমার হাত ধরে আছো।

-তাতে অসুবিধাটা কি হচ্ছে? আপনার হাত ক্ষয়ে যাচ্ছে!

-না, কিন্তু পিংকি এবং সামি আমাদের সাথে রয়েছে।

আভা হাত ছেড়ে দিয়ে নীচু গলায় বললো - আপনার নিজের তাহলে বিশেষ আপত্তি নেই?

-এই আলাপটা পরে কখনো করা যাবে।

পিংকি দীপু এবং আভার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। -আমাদের জন্য অপেক্ষাও করলে না তোমরা!

দীপু মাথা চুলকিয়ে বললো - তোরা তো ঠিক আমাদের পেছনে ছিলি, দেরী হলো কোথায়?

-সিগনালে আটকা পড়েছিলাম।

সামি নিরীহ কণ্ঠে বললো - নতুন ড্রাইভার। কখনো রেড লাইট টপকে যায় কখনো আবার গ্রীন লাইটেই থেমে যায়।

-কি আবোল তাবোল কথা বলো? গ্রীন লাইটে কখন থামলাম আমি?

দীপু হেসে ফেললো। -তুই ড্রাইভ করছিস জানলে আরো আস্তে চালাতাম।

-ফালতু কথা বলো না ভাইয়া। আমি অতো কাঁচা ড্রাইভার না।

সে দ্রুতহাতে ক্যামেরা বের করলো।

-ঝট্ পট্ কয়েকটা ছবি তুলে এখান থেকে কেটে পড়ি চলো। শীতকালে এখানে কিছু দেখার নেই।

আভা স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। এই অকারণ ব্যস্ততার কারণ বুঝতে তার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। সে বললো - আমার কিন্তু জায়গাটা খুব ভালো লাগছে। চার দিকটা হেঁটে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

-দেখার তেমন কিছু নেই এখানে। Fall- এ এলে গাছপালা দেখা যায়। এখনতো তাও নেই। গাছগুলো তো সব ন্যাড়া হয়ে আছে।

দীপু বললো- এলামই যখন, একটুক্ষণ থাকি। পিংকির মুখ থমথমে হয়ে গেছে। কিন্তু সে কোন আপত্তি করলো না। ঢালু রাস্তা বেয়ে গজ ত্রিশেক গেলেই ডানে গভীর উপত্যকা চোখে পড়ে। দুই পাহাড়ের সঙ্গমে চিকন একটি ঝর্না। পাহাড়ের শরীর বেয়ে গজিয়ে উঠা অসংখ্য বৃক্ষের সারি। অধিকাংশই পত্রহীন, ধুসর সাদা। থাকে থাকে জমে আছে শুভ্র বরফ। দু'দিকে রেলিং ঘেরা একটি সিঁড়ি নেমে গেছে পাহাড়ের শরীর বেয়ে। আভা সেটি দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। - দীপু ভাই, চলেন নামি।

দীপু উত্তর দেবার আগেই ধমকে উঠলো পিংকি। - তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে আভা? গরমের সময়েও কেউ ওখানে নামতে সাহস করে না।

দীপু বললো- সিঁড়িতে বরফ জমে থাকতে পারে। এখন নামাটা বিপদজনক।

সামি বেশ উৎসাহী কণ্ঠে বললো - দেখে তো শুকনো মনে হচ্ছে। নামলে হয়! চলো মনা, আমি তোমাকে ধরে থাকবো।

তার মনা তাকে একটি কড়া ধমক দিলো। - না, এই সব আদিখ্যেতার কোন মানে হয় না। চলো ভাইয়া, এখনই ফিরবো।

আভার জেদ চেপে গেছে। সে কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রেলিং টপকে ওপাশের অপ্রশস্ত সমতলে নামলো। আট দশটি পাথরের চাঙড় পেরিয়ে সিঁড়িতে পৌঁছে গেলো সে। পিংকি রাগী গলায় বললো - এই আভা, এসব কি বাঁদরামী হচ্ছে?

আভা কোন জবাব দিলো না। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে সে। দীপু তার পিছু নিলো। - তোরা এখানে দাঁড়া। আমি গিয়ে ওকে নিয়ে আসছি।

পাথরের চাঙড়গুলি টপকাতে গিয়েই দু'বার হোঁচট খেলো দীপু। পেছন থেকে সামি এবং পিংকির চীৎকার শোনা গেলো। হাত তুলে তাদেরকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলো দীপু। কিন্তু প্রায় খাড়া নীচে নেমে যাওয়া সিঁড়িটা দেখেই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো ওর। উচ্চতা সম্বন্ধে ওর আতংক আছে। পা কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যায়। আভা স্বাচ্ছন্দ্যে নেমে যাচ্ছে। দীপু চিৎকার করে ডাকলো - আভা!

আভা পিছু ফিরে তাকালো। দীপুকে দেখে তার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো। হাতছানি দিয়ে ডাকলো সে। দীপু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। আভা জানে দীপু তাকে অনসুরণ করবে। সে অসম্ভব ধীর গতিতে সিড়ি টপকাতে লাগলো। আভা তার সাবধানী ভঙ্গী দেখে খিল্ খিল্ করে হাসছে। দীপু খুবই বিরক্ত হচ্ছে। অকারণে এই বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়ে খুব মজা দেখা হচ্ছে। নারী জাতির সমস্যাটা কি?

ঝর্না পর্যন্ত পৌছানো গেলো না। নীচের দিকের সিঁড়িগুলো পুরু বরফে ছেয়ে আছে। আভা হতাশ গলায় বললো- যাহ্, এখনো গলেনি।

দীপু কটূক্তি করলো-বরফ গলার দরকার কি? গড়িয়ে নেমে যাও। খামোখা এই রকম জেদ করার কোন অর্থ হয়?

আভা হেসে উঠলো- আপনাকে আমার পিছু পিছু কে আসতে বলেছিলো?

-ভুতে। এখন ফিরে যাবে নাকি এখানে দাঁড়িয়েই খোশগল্প করবে? ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

-পিংকি আপা আমার উপরে এতো ক্ষ্যাপা কেন বলেন তো?

- সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করো। আমি টেলিপ্যাথি জানি না।

-আপনি কিছুই জানেন না। গাধার গাধা।

-বাজে কথা বলবে না। চলো, ফেরা যাক।

-এতো ফিরি ফিরি করছেন কেন? আমার পাশে দাঁড়াতে খারাপ লাগছে?

- তোমার পাশে জীবনে বহুবার দাঁড়িয়েছি। এতে ভালো কিংবা খারাপ লাগার কিছু নেই।

আভা ভ্রু কুঁচকে তাকালো। - এমন ভাব করছেন যেন আপনার কাছে আমি আরো দু'দশটা মেয়ের মতো। আমার জন্য আপনি একসময় পাগল ছিলেন সেটা মনে আছে?

-হঠাৎ পুরানো কথা তুলছো কেন?

-আমাকে কেউ ছোট করে দেখলে আমার খুব রাগ হয়। আপনি সেটা খুব ভালো করেই জানেন। অনেকদিন ধরেই তো দেখছেন আমাকে। তারপরও ঐ ধরনের কথা কেন বলেন?

দীপু আভার চোখে চোখ রেখে বললো - আমার প্রতি তোমার কোনদিনই তেমন আগ্রহ ছিলো না। এবার এসে তুমি এমন আচরণ করছো কেন?

আভা গম্ভীর হয়ে পড়লো। দীপুর প্রশ্নের উত্তর দিলো না সে। সিঁড়ি টপকে উপরে উঠতে শুরু করলো। -চলেন, ফেরা যাক। সামি ভাইরা চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেলছে।

দীপুকে কান পাততে হলো না। সামি এবং পিংকির যুগ্ম কণ্ঠ চারপাশের পাহাড়ী দেয়ালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে-ভাইয়া-য়া-য়া -----------। দীপু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই প্রতিধ্বনি শুনলো। খুব প্রিয় দু'জন মানুষের উদ্বিগ্ন মুখগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যেন সে। বেশ দ্রুতগতিতে উঠে যাচ্ছে আভা। দীপুর জন্য অপেক্ষা করছে না। দীপু ডাকলো - এই আভা! দাঁড়াও।

আভা থামলো না। সে পেছন ফিরেও তাকালো না।

৭

সেলসবারি কম করে হলেও দেড় ঘন্টার পথ। ইন্টারস্টেট 91 সাউথ ধরে যেতে হয় অনেকখানি। তার পরে Route-2 ধরে আরো চলিশ পয়তালিশ মিনিট। রনির বাসায় এর আগেও একবার গেছে দীপু কিন্তু সেবার ড্রাইভ করছিলো সামি। ফলে পথঘাট কিছুই খেয়াল নেই ওর। নিজে ড্রাইভ না করলে রাস্তা মনে রাখা তার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। নিজের স্বরণ শক্তির উপরেও তার বিশেষ আস্থা কখনই ছিলো না। এক রাস্তায় দশবার গিয়েও সে রাস্তা ভুল করেছে। ফলে সামিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করছে ও। সামি লেন চেঞ্জ করলে সেও লেন চেঞ্জ করছে। সামি ব্রেক কষলে সেও ব্রেক কষছে। দীর্ঘক্ষণ মুখ বুঁজে বসেছিলো আভা। কিন্তু এক পর্যায়ে তার ধৈর্যের বাঁধ ছুটে গেলো। -দীপু ভাই, আপনার সমস্যাটা কি? অকারণে ডানে বাঁয়ে করছেন কেন?

-পথ চিনি না। ওদেরকে হারালে বিরাট ঝামেলায় পড়ে যাবো।

-আপনার মতো এই রকম ভীতুর ডিম জীবনে দেখিনি। এই রকম ফক্ ফকা দিনে একশ' মাইল দুর থেকেও গাড়ী চেনা যায়। হারানোর প্রশ্নটা উঠছে কি ভাবে?

সামি বাঁয়ের লেনে গিয়ে ধীর গতির একটি গাড়ীকে ওভার টেক করলো। দীপু নিজেকে নিরস্ত করলো। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আভা বললো - কি হলো, রাগ করলেন নাকি?

-না। তোমার রাগ পড়েছে?

আভা সে কথার উত্তর দিলো না। সে জানালা খুলে দিলো। বেশ উষ্ণ বাতাস। গতকালের তুলনায় অনেক স্বস্তিকর। এই এলাকায় আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় ঘন্টায় ঘন্টায়। এই গরম, এই বৃষ্টি, এই তুষার।

আভা চুল সামলাতে সামলাতে বললো - আপনি দেশে ফিরছেন কবে?

- কেন?

আভা ভ্রু কুঁচকে ফেললো। - সব কথায় এতো কেন কেন করেন কেন? একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর সাধারণভাবে দিতে পারেন না।

দীপু বললো - এই গ্রীষ্মে যাবার ইচ্ছা আছে। আমার এখনো H1B হয়নি। আমার কনসালটিং কোম্পানী এপাই করেছে, পেতে পেতে এপ্রিল লেগে যাবে। তারপরে ছুটি পাওয়ার ব্যাপার আছে। তোমার কি অবস্থা?

-আমি অনেক আগেই পেয়ে গেছি। AT&T এসব ব্যাপারে খুব তৎপর।

-ক'দিন থাকবে দেশে?

-জানি না। ফেরা হবে কিনা তাও জানি না। বাবা তার ব্যবসা দেখতে বলছেন।

-মন্দ কিছু বলেননি। চাচার বয়স হচ্ছে। নিজেদের এতো বড় ব্যবসা থাকতে অযথা এই দেশে পড়ে থাকবে কেন?

আভা ধমকে উঠলো-আমার ডিগ্রী কম্পিউটার সায়েন্সে, টেক্সটাইলের আমি কি বুঝি? আপনার কি কোনদিনই কান্ডজ্ঞান হবে না? আমাকে এতো বড় বড় লেকচার না শুনিয়ে নিজে গিয়ে আপনার বাবার মেডিসিনের ব্যবসায় কেন নেমে পড়ছেন না?

দীপু খুক্ খুক্ করে কাশলো। - আমার বাবার মেডিসিন আর তোমার বাবার টেক্সটাইল এক বস্তু নয়।

-চুপ করে থাকেন। একদম বক্ বক্ করবেন না।

-এতো রেগে যাচ্ছো কেন? খারাপ কথা কি বললাম?

-বাংলাদেশের মতো জায়গায় একটা মেয়ে টেক্সটাইল মিল চালাচ্ছে, এই দৃশ্যটা কল্পনা করেছেন কখনো? একটা মহিলা ড্রাইভার দেখলে সারা রাস্তার মানুষ আধ হাত জিভ দেখিয়ে টিটকারী দেয়। একাকী রাস্তায় হাঁটা পর্যন্ত যায় না। প্রত্যেক কদমে একটা করে নোংরা কথা শুনতে হয়। দেশে ফিরতে পর্যন্ত ইচ্ছা হয় না আমার।

দীপু গম্ভীর মুখে বললো- এই জাতীয় ব্যাপার সবখানেই কম বেশী হয়। এই দেশেই প্রতিনিয়ত বহু মেয়ে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। নারী নির্যাতনের হারও নিতান্ত কম নয়।

-তারপরও এই দেশে অন্তত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা যায়। ভীড়ের মধ্যে কেউ বুকে পাছায় হাত ডলে দেবে, সেই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতে হয় না।

- তেমন জায়গাও আছে। তবে সেইসব এলাকা এড়িয়ে চলাটা সম্ভব। বাংলাদেশে সেটা সম্ভব নয়, স্বীকার করছি। কিন্তু এটাও ভুলে যেও না আমাদের প্রধান দু'জন নেতাই এখন মহিলা। পরিস্থিতি নিশ্চয় বদলাবে।

-বদলাবে না ছাই! নেতা পুরুষই হোক আর মহিলাই হোক তাদের ক্ষমতা হচ্ছে পুরুষ। আমরা অবলা নারী! আমাদের জায়গা বিছানায়।

-হঠাৎ এতো ক্ষেপলে কেন তুমি?

-জানি না। কিন্তু আমার দেশে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। বেশ আছি এখানে।

দীপু চুপ করে গেলো। তার নিজেরও স্থায়ীভাবে দেশে ফিরবার বিশেষ ইচ্ছা হয় না। তার বন্ধুরা সকলেই ভালোই কাজ কর্ম করছে। এখন ফিরে গিয়ে নতুন করে ক্যারিয়ার গড়াটা কতখানি সহজ হবে সে বুঝতে পারে না।

সামিকে অনুসরণ করে ঢালু এক্সিট বেয়ে নেমে এলো দীপু।

চারপাশের অসংখ্য সাইন বোর্ডে কোথাও Route-2 জাতীয় কিছু চোখে পড়লো না। দীপু বুঝলো, আবার গুলিয়ে ফেলেছে সে। Route-2 নিতে হয় ফক্সউড ক্যাসিনোতে যাবার সময়। এখান থেকে ঘন্টা দেড়েকের পথ। দর্শণীয় জায়গা। শহর থেকে বেশ দূরে থেকেও তার সুউচ্চ চূড়া চোখে পড়ে। পাহাড় ঘেরা উপত্যকায় রং ঝলমলে দালানটি হঠাৎ করে দেখলে প্রাচীন রহস্যময় রাজপ্রাসাদের মতো মনে হয়।

ঘন ঘন বাঁক নিচ্ছে রাস্তা। দু'পাশের রুক্ষ ধুসর বনানীর মাঝ দিয়ে চিকন রাস্তা, কোন রকমে দু'টি গাড়ী পাশাপাশি চলার মতো। বছর তিনেক গাড়ি চালাচ্ছে দীপু। এখনও এই জাতীয় রাস্তায় সমস্যা হয় দীপুর। আভা জানালায় মুখ রেখে বাইরে তাকিয়ে ছিলো। তার কালো মসৃন চুলে বাতাসের ঢেউ। চোখ আটকে যাচ্ছে দীপুর। আভাকে উদাসীন হতে খুব একটা দেখেনি সে। এই দৃশ্যটি তার কাছে নয়নাভিরাম মনে হচ্ছে।

হঠাৎই জানালা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসলো আভা। আঙুল বুলিয়ে চুল ঠিক করতে করতে বললো- চোখ রাস্তার উপরে রাখেন। আমার দিকে অমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকবেন না। অসহ্য লাগে।

দীপু কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললো- বাজে কথা বলবে না।

আভার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো।- ধরা পড়ে খুব খারাপ লাগছে।

-আমি ড্যাব ড্যাব করে কারো দিকে তাকিয়ে থাকি না।

-না, থাকেন না। আমার স্কুলের সামনে দিনের পর দিন হা করে দাঁড়িয়ে থাকতো কে?

-আবার ছোটবেলার কথা তুলছো!

-এক'শবার তুলবো।

দীপু কথা বাড়ালো না। এই সব কথা উঠলেই তার কান গরম হয়ে উঠে। কম বয়সে এই মেয়েটির জন্য অনেক পাগলামী করেছে সে। আভাদের বাসাতে তার অবারিত যাতায়াত ছিলো; কিন্তু তারপরও মেয়েদের স্কুলের সামনে ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে না থাকলে তার পেটের ভাত হজম হতো না। লজ্জা রাখার জায়গা নেই তার।

আভা আড় চোখে তাকে দেখছিলো। তার ঠোঁটের ডগায় হাসিটা এখনো ঝুলছে। সে কোমল গলায় বললো-কয়েকদিন আগে আপনাদের বাসায় ফোন করেছিলাম। চাচীর সাথে অনেকক্ষণ কথা হলো।

-কি আলাপ হলো?

-মেয়েলী আলাপ। সব কথা আপনাকে বলা যাবে না। তবে চাচীর কথা শুনে মনে হলো বাইরে যতই অনাগ্রহ দেখান, ভেতরে আপনি বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে আছেন।

-মা তোমাকে এই কথা বলেছে?

-একটু ঘুরিয়ে বলেছেন। কিন্তু এতে এতো লজ্জা পাবার কি আছে? এই প্রসঙ্গ উঠলেই আপনি এতো বিগড়ে যান কেন?

দীপু বিরক্ত ভঙ্গিতে বললো-বিগড়ে যাবো কেন? এসব কি জাতীয় কথাবার্তা?

আভা সশব্দে হেসে উঠলো।-আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন মনে আছে?

দীপু রাস্তার উপর থেকে তার দৃষ্টি এক চুলও নড়ালো না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার খোটা দিলো আভা- কি হলো, মশাইয়ের মুখে কথা নেই কেন?

- সে ব্যাপার তো চুকে গেছে। এখন আবার ঐ প্রসঙ্গ তোলার দরকারটা কি?

-আপনি কি ভেবেছিলেন, আপনাকে আমি বিয়ে করবো?

-চুপ করে থাকো।

আভা চোখ মুখ উজ্জ্বল করে হাসছে।

-আপনার মতো গাধাকে কেউ বিয়ে করবে না।

দীপু বিরক্তি নিয়ে বললো - হ্যাঁ, আমি গাধা আর তুমি চালাকের আঁটি। বেশী বক্ বক্ করো না তো।

আভা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। দীপু এই আনন্দে শরীক হতে পারছে না। আভার প্রত্যাখান তাকে অসম্ভব যন্ত্রণা দিয়েছিলো। কারো প্রতি দূর্বলতা থাকার চেয়ে জঘন্য কিছু আর হতে পারে না।

আভা হাসি থামিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে। - রাগ করবেন না। আপনাকে ক্ষেপিয়ে খুব মজা পাই।

দীপুর দৃষ্টি রাস্তাতেই আঠার মতো আটকে থাকলো। তার সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আভার কথার প্রত্যুত্তর দিলো না সে।

৮

সেলসবারি ছোট শহর। মূলত রেসিডেনশিয়াল এরিয়া হিসাবেই গড়ে উঠেছে শহরটি। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি পার্শ্ববর্তী শহরে। ছিমছাম দর্শন ছোট ছোট ঘরবাড়ী দেখে বেশ মুগ্ধ হয়ে গেলো দীপু। ব্যস্ত নাগরিক জীবন কখনই বিশেষ ভালো লাগে না তার। বিশেষ করে ঢাকার অসম্ভব ব্যস্ত জনপদে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে নাগরিক জীবনের প্রতিই অনীহা ধরে গেছে তার। ডেট্রয়েট থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি। তিন বছরে তিনবার ডেট্রয়েটে গেছে দীপু। বোষ্টন থেকে মাত্র আধ ঘন্টার পথ মার্লবোরো। গত আট মাসে দু'বার বোষ্টনে গেছে সে। দু'বারই ট্রেন ষ্টেশনে, বন্ধুকে রিসিভ করতে। আমেরিকার ঐতিহ্যময় শহর বোষ্টন। কেউ এই কথা শুনলেই চোখ বড় বড় করে ফেলে- সে কি! তুমি বোষ্টন ঘুরে দেখনি?

রনির একটি গ্যাস ষ্টেশন আছে। ওর বাসায় যাবার পথেই পড়ে। চারপাশের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে চমৎকার মানিয়ে গেছে ছোট্ট ছবির মতো ষ্টেশনটি। রনিকে সেখানেই পাওয়া গেলো। দু'বছর হলো বিয়ে করেছে সে। হৃদয় সংক্রান্ত

ব্যাপার। নিউইয়র্কের ব্যস্ত জনপদ ফেলে এই বিরাণ এলাকায় চলে আসতে হয়েছে তাকে। গ্যাস ষ্টেশনটি শ্বশুরের। সে এবং তার স্ত্রী দেখাশুনা করছে। অধিকাংশ সময় তারা দু'জনাই কাজ করে। বেশী মানুষ রাখার অর্থ লাভ কমে যাওয়া। এই মূহুর্তে সেটি তাদের কাম্য নয়। তাদেরকে দেখেই ছুটে এলো রনি। দীপুকে সে ভালোমতোই চেনে, আভার কথা বিক্ষিপ্তভাবে কিছু শুনেছে।

সামি বললো- দোস্ত, পার্টি কি বাসাতেই?

রনি লজ্জিত মুখে বললো- ছোট এপার্টমেন্ট। ওখানে পার্টি দেয়া যায় না। ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্ট রিজার্ভ করেছি আমরা। ওদের রান্না খুবই ভালো।

পিংকি বললো - পার্টি চারটায়। অথচ আপনি এখনো কাজ করছেন!

রনি কাঁধ ঝাঁকালো। - কি করবো ভাবী? ইন্ডিয়ান একটা ছেলে কাজ করে; কিন্তু সে তিনটার আগে আসতে পারবে না। দোকান খোলা রেখেতো যাওয়া যায় না।

আভা ষ্টেশনের ভেতরে অবস্থিত দোকানটি ঘুরে ফিরে দেখছিলো। সে গভীর আগ্রহ নিয়ে বললো - আপনার আপত্তি না থাকলে আমি কাজ করবো। গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করার ভীষণ ইচ্ছা আমার।

পিংকি বেশ কড়া একটি ধমক দিলো-না, তোমাকে গ্যাস ষ্টেশনের কাজ করতে হবে না। এই সব আহলাদ অন্য কোথাও দেখিও। তুমি আমাদের সাথে যাবে।

রনি হেসে ফেললো।-ভাবী, উনি বলেইতো আর আমি কাজ করতে দিচ্ছি না। আপনি অযথা রেগে যাচ্ছেন।

পিংকি বিরক্ত কণ্ঠে বললো-না রনি ভাই। আমার রাগার যথেষ্ট কারণ আছে। এই মেয়ে খুব সমস্যা করে। আভা তুমি গাড়ীতে গিয়ে বসো।

আভা নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো-আমি ছোট মেয়ে নই পিংকি আপা। আমার সাথে এভাবে কথা বলো না।

-তোমার আচরণ দেখে তোমাকে ছোট মেয়েই মনে হচ্ছে।

-তুমি আমার উপরে এতো ক্ষেপে আছো কেন বলতো?

-এতে ক্ষ্যাপাক্ষেপির প্রশ্ন উঠছে কেন? পিংকির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। রাগ ঢাকবার বিশেষ চেষ্টাও করছে না সে। দীপু আভাকে তার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলো।

রনি আড়ষ্ট ভঙ্গীতে বললো-সামি, তোরা বাসায় যা। আমি আধঘন্টার মধ্যেই ফিরছি।

সামি নিজেই যথেষ্ট অস্বঃস্তি বোধ করছিলো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটি ফ্যামিলি কোন্দল। সুতরাং সে এর মধ্যে নাক গলিয়ে বিপদে পড়তে চায় না। গাড়ীতে উঠে ভুলেও স্ত্রীর দিকে ফিরলো না সে। এই জাতীয় মুহূর্তে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুলের জন্যও ভয়াবহ ঝাড়ি খাবার সম্ভাবনা থাকে।

রনির বাসা গ্যাস ষ্টেশন থেকে মাইল তিনেক। নিঃশব্দে সামিকে অনুসরণ করলো দীপু। আভা বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে বিশেষ উত্তেজিত মনে হচ্ছে না। দীপু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। মেয়েদেরকে সে এমনিতেই বিশেষ ভালো বোঝে না। কিন্তু এই মেয়েটিকে সে বিন্দুমাত্র বোঝে না। তার মস্তিকের গভীরে যে আবেগের খেলা চলে তার কিছুই সে ধরতে পারে না। নিজেকে খুব অসহায় মনে হয় দীপুর।

রনিদের এপার্টমেন্টে প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। অধিকাংশেরই ধারণা ছিলো অনুষ্ঠানটি বাসাতেই হবে। খুব সম্ভবত হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছে রনিরা। ঘর ভর্তি বাংলাদেশী দেখে আভা খুব অবাক হয়ে গেলো। এই প্রত্যন্ত এলাকাতেই এতো জন স্বদেশীর দেখা পাওয়া যাবে সেটা বোধহয় সে আশা করেনি। লুনা বাচ্চা কোলে নিয়ে ছুটে এলো। পিংকির সাথে তার বিশেষ রকম হৃদ্যতা আছে। সে মেয়েদেরকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলো। সামি এবং দীপু লিভিংরুমে জনাচারেক গম্ভীর দর্শন মাঝবয়সী ভদ্রলোকের সাথে যোগ দিলো। এক দঙ্গল বাচ্চাকাচ্চা মহানন্দে ছুটাছুটি করছে। ঘন ঘন ধমক খাচ্ছে তারা, কিন্তু তাদেরকে নিরস্ত করাটা এতো সহজ নয়।

স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আলাপ হচ্ছে। বাংলাদেশীরা এক জায়গায় হলেই একথা সে কথার পর বিএনপি, আওয়ামী উঠে পড়ে। তর্কাতর্কি, হাতাহাতি, পিটাপিটি হতেও দেখেছে দীপু। যে দেশের নাম শুনলেই এই দেশের অধিকাংশ মানুষের চোখে বন্যা কবলিত, খরা পীড়িত, অভুক্ত মানুষদের একটি স্থানের ছবি ভেসে ওঠে, সেই দেশের মানুষেরা সে সব নিয়ে কখনই বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হয় না। ইদানিং রাজনীতি শব্দটি দীপুর কাছে অশালীন মনে হয়। সে এই আলাপে যোগ দিলো না। সামির অবশ্য এই সব ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ। সে বেশ দ্রুত আলাপে জড়িয়ে গেলো। দীপু কিঞ্চিৎ বিরক্তি বোধ করছে। খুব সম্ভবত এরা রনির জন্য অপেক্ষা করছে। সে বাইরে এসে একটি সিগ্রেট ধরালো।

আভা নীচে নেমে এসেছে। দীপু বললো-সুন্দর জায়গা।

আভা দীপুর হাত থেকে সিগ্রেটটা ছিনিয়ে নিয়ে পায়ের নীচে পিষলো-এতো সিগ্রেট খাওয়া লাগে কেন আপনার?

-মাত্র দু'টান দিয়েছিলাম।

-আমি পাশে থাকলে একদম সিগ্রেট টানবেন না। অসহ্য লাগে।

-তোমার মন যুগিয়ে চলতে হবে নাকি আমাকে?

-সবাইকেই অন্যের মন যুগিয়ে চলতে হয়। চলেন, একটু হেঁটে আসি।

দীপু নিঃশব্দে আভাকে অনুসরণ করলো। এপার্টমেন্ট কমপেক্সের ঠিক পাশ দিয়েই গেছে একটি ইন্টারনাল রাউট। ট্রাফিক সামান্যই। এই এলাকায় খুব বেশী মানুষের বসবাস আছে বলে মনে হয় না। আভা বললো-লুনা ভাবীদের ভালোবেসে বিয়ে হয়েছিলো এটা আপনি জানেন?

-শুনেছি। হঠাৎ এই প্রসঙ্গ তুললে কেন?

-ঘটকালীর বিয়েতে আমার খুব ভয়। কে জানে মানুষটা কেমন হবে? হয়তো বিয়ের পর শুনবো ছেলে মহামদ্যপ। রেগে গেলে মাথা ঠিক থাকে না। হাজার খানেক মেয়ের সাথে খাতির। এমনি আরো কত কি হতে পারে।

-একই ভয় ছেলেদেরও থাকে।

আভা একটু চুপ করে থেকে বললো-মাঝে মাঝে মনে হয় ভুলই করেছি। একটা ভালো ছেলে দেখে আগেই ঝুলে যাওয়া উচিৎ ছিলো। আমার অবস্থা হয়েছে বাঁছতে বাঁছতে গাঁ উজাড়।

আভা সশব্দে হাসছে। দীপু সেই হাসিতে যোগ দিতে পারলো না। সে নিজেও যে এই বাঁছাবাঁছির শিকার এই সত্যটি তার কাছে বিশেষ স্বস্তিকর মনে হচ্ছে না। আভা তার পিঠে একটা কড়া খোঁচা দিলো।

-কি ব্যাপার, এমন চুপ করে আছেন কেন?

-সব সময় তোমার মতো বক্ বক্ করতে হবে নাকি?

-আমি সব সময় বক্ বক্ করি?

দীপু বললো- চলো ফেরা যাক। অনেকদূর চলে এসেছি আমরা। আমাদেরকে না দেখলে পিংকি চিন্তা করতে শুরু করবে।

আভা ফিক্ করে হেসে ফেললো। - পিংকি আপা আমার উপর এতো ক্ষ্যাপা কেন সেটা কিন্তু আমি জানি।

-তুমি তো সবজান্তা।

-সবজান্তাই তো। অন্ততপক্ষে আপনার কিছু জানতে আমার বাকী নেই।

-আমার কিছু জানো না তুমি।

-তাই? মনিকার কথা কিন্তু আমি জানি।

-হঠাৎ মনিকার কথা উঠছে কেন?

-কি সুন্দর সোনালী চুলের মেয়ে! আপনাকে এতো পছন্দ করতো। আপনি এমন ভাব-সাব দেখালেন।

-বন্ড-ফ্লন্ড আমার পছন্দ না।

আভা ঠোঁট টিপে হাসলো।-জানি আপনার কি পছন্দ। হরিণী চোখের মেঘল কেশবতী কন্যা!

-এতো ঢং করে বলছো কেন?

আভা হেসে বললো। - মনিকার সাথে সেদিনও কথা হয়েছে আমার। আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলো। বেচারী এক ছেলের সাথে ঘোরাফেরা করছিলো, পরে জেনেছে ঐ ছেলের নাকি বউ-টউ আছে। খুব মুষড়ে পড়েছে। আমার কাছে ওর ফোন নাম্বার আছে।

দীপু অসম্ভব বিরক্তি নিয়ে বললো-আভা, মনিকা সম্বন্ধে আমি কথা বলতে আগ্রহী নই। এদেশী মেয়েদের আমার পছন্দ হয় না। হাজারখানেক ছেলের সাথে বিছানায় গিয়ে যুতসই বর খুঁজে বের করার রীতিটা আমার কাছে নোংরা মনে হয়। মনিকারও গন্ডা গন্ডা বয় ফ্রেন্ড ছিলো। মাঠে-ঘাটে বালুচরে কোথাও সেক্স করতে বাকী রাখেনি সে। ওর শরীর ছুঁলে আমাকে হিন্দুদের মতো গঙ্গাস্নান করতে হবে।

আভা গম্ভীর মুখে বললো-আপনি কখনো কাউকে ছোঁননি?

-সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। চলো ফেরা যাক।

আভা আপত্তি করলো না। সে নীচু গলায় বললো-আমি কিন্তু ওদের মতো নই।

দীপু কিঞ্চিৎ রুক্ষ গলায় বললো- তোমাকে নিয়েও আমি আগের মতো অতো চিন্তা করি না।

আভা আহত কণ্ঠে বললো-হঠাৎ আমার উপরে ক্ষেপলেন কেন? আমি কি করলাম?

-তুমি সব সময় আমাকে অপমান করার চেষ্টা কর।

দীপুর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে কোন প্রত্যুত্তর খুঁজে পেলো না আভা। বেশ দূর থেকেই রনির ভ্যানটা দেখা গেলো। যার অর্থ ফিরে এসেছে ও। খুব সম্ভবত ইতিমধ্যেই দীপুদের খোঁজ পড়ে গেছে। দীপু হাঁটার গতি বাড়ালো।

আভা তার সাথে তাল মেলানোর চেষ্টা করতে করতে বললো-দীপু ভাই, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

-কি অনুরোধ?

-আগামীকাল আমাকে একটু স্যালেম (Salem) এ নিয়ে যাবেন।

দীপু অবাক হয়ে গেলো। - স্যালেম?

-হ্যাঁ। আপনার ওখান থেকে এক- দেড় ঘন্টার পথ।

-হঠাৎ স্যালেম কেন?

-একটু দরকার আছে। নিয়ে যাবেন তো? না হলে আমাকে গাড়ী রেন্ট করে যেতে হবে।

দীপু দাঁড়িয়ে পড়লো।-এটা তোমার আরেকটা খামখেয়ালীপনা তাই তো?

-না। গেলেই দেখতে পাবেন।

দীপু শ্রাগ করলো।- জোর করলে তো যেতেই হবে।

-আমি জোর করছি না, অনুরোধ করছি।

-সব সময় তো জোরই করো।

আভা কিছু বলার সুযোগ পেলো না। নারী-পুরুষ-শিশুর দলটি বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাদের দু'জনকে কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে পরখ করছেন মহিলারা। দীপুর কান লাল হয়ে উঠলো। আভা অপ্রতিভ কণ্ঠে বললো-লুনা ভাবী, আপনাদের এই জায়গাটা ভীষণ সুন্দর।

লুনা অকারণে হেসে উঠলো। বোঝা গেলো ইতিমধ্যেই তাদেরকে নিয়ে হালকা জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। দীপু রীতিমতো ঘামতে শুরু করলো।

৯

রেষ্টুরেন্টটির নাম 'জয় অব ইন্ডিয়া'। মালিক বাংলাদেশী। আমেরিকায় ইন্ডিয়ান কুইসাইনের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। অধিকাংশ মানুষই সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে ইন্ডিয়া হিসাবেই চিনে থাকে। ফলে মানুষ টানতে হলে ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্ট হিসাবে চালানোটাই সুবিধাজনক। এদেশীয় মানুষেরা মশলা জাতীয় বস্তুর প্রতি খুব অনুরক্ত নয়। প্রায় লবণহীন আধ সিদ্ধ, আধ পোড়া খাবার দেখেই অধিকাংশেরই জিভে পানি এসে যায়। তারপরও প্রচুর মানুষ আছে যারা মশলাদার খাবারের ভক্ত। চাইনিজ এবং ম্যাক্সিকান রেষ্টুরেন্টগুলি রমরমা ব্যবসা করে। ইণ্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টও মোটামুটি ভালই চলে। দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার মিষ্টান্ন অনেকেরই খুব পছন্দ।

সব মিলিয়ে ষাট জনের মতো অভ্যাগত। অনেকেই রনির পুরানো বন্ধু। তারা এসেছে নিউইয়র্ক, নিউজার্সি থেকে। তারা সকলেই সামির পরিচিত। দীপুর কাছে সবাই অপরিচিত। সামির সূত্র ধরে কয়েকজনের সাথে পরিচয় হলো। কথাবার্তা অবশ্য বিশেষ জমলো না। অধিকাংশই বিবাহিত, প্রচুর অর্থের মালিক, যদিও পেশাগত দিক থেকে খুব উঁচু স্তরে ওঠাটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বেশ কয়েকজন ট্যাক্সি চালায়। অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ, লেগে থাকলে প্রচুর পয়সা। কিন্তু তারপরও সকলের মধ্যেই অল্প স্বল্প হীনমন্যতা কাজ করে থাকে। দীর্ঘদিনের পরিচয় না থাকলে ঝট্ করে তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে পড়াটা বেশ কঠিন কাজ। দীপুর জন্য সেটা আরোও কঠিন। অমিশুক বলে তার বিশেষ রকম কুখ্যাতি আছে। প্রচুর খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয়েছে। দীপু ভোজনরসিক। সে খাবারে মনোযোগ দিলো।

পিংকি এবং আভা দু'জনই আলাপী। অচিরেই তাদের হৈ-চৈ এবং হাসির শব্দে রেষ্টুরেন্টটি মুখরিত হয়ে উঠলো। তাদেরকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই আজ সকাল থেকে তাদের দু'বার ঝগড়া হয়ে গেছে।

পার্টি চললো সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত। অনেকেই এসেছে বেশ দূর থেকে। অনেকখানি ড্রাইভ করতে হবে তাদেরকে। সন্ধ্যা হবার সাথে সাথে ঝট্পট্ বিদায় নিলো তারা। রাতে তুষার পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। রনি একরকম জোর করেই তার বন্ধুদেরকে বাসায় নিয়ে গেলো। সেখানে তিনঘন্টা ধরে রাতে রনির বাসায় থাকা নিয়ে প্রচুর তর্ক বিতর্ক চললো। রনি সবাইকেই ধরে রাখতে চায়, কেউই থাকতে আগ্রহী নয়। প্রথমতঃ রনিদের বাসায় সবার স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব, দ্বিতীয়তঃ পরদিন সকালে কয়েকজনকে কাজে ফিরে যেতে হবে। রাত দশটার দিকে হালকা তুষার পড়তে শুরু করলো। রনির বাধা সত্বেও বেরিয়ে পড়লো সবাই। তুষারের কোন ঠিক নেই। দু'ইঞ্চির জায়গায় ছ'ইঞ্চি পড়ে রাস্তাঘাট সয়লাব করে দিতে পারে। এখানে আটকা পড়ে যেতে কেউই আগ্রহী নয়।

সেলসবারি থেকে মার্লবোরো ঘন্টা দুয়েকের পথ। 91-84-90-495। এখান থেকে 91 এর এন্ট্রান্স আধ ঘন্টার পথ। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। হেডলাইটের আলোই ভরসা। ট্রাফিক প্রায় নেই বললেই চলে। খুব হালকা তুষার, কিন্তু তারপরও একটু লক্ষ্য করলেই রাস্তার উপরের পাতলা সাদা তুষারের চাদরখানা চোখে পড়ে। এই রকম রাস্তায় ভয়াবহ একটা দূর্ঘটনা ঘটেছিলো দীপুর। একটু জোরের উপর বাঁক নিতে গিয়ে সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে পড়লো গাড়ী, রাস্তার উপরে বাই বাই করে দুই চক্কর দিয়ে পাশের দশফুটি খাঁদে গিয়ে গোত্তা খেলো। কপাল ভালো ছিলো। শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি তেমন কিছু হয় নি। গাড়ীটা অবশ্য দুমড়ে মুচড়ে শেষ। ফেলেই দিতে হলো। অনেক কষ্টে জমানো টাকার গাড়ী। ভাবলে এখনো দীপুর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু ঘটনা থেকে ভালো একটা শিক্ষা হয়েছে ওর। রাস্তায় তুষার দেখলেই দশগুণ সাবধান হয়ে যায় সে। দীপুকে প্রায় উইন্ডশীল্ডে নাক লাগিয়ে ড্রাইভ করতে দেখে বক্রোক্তি করলো আভা - দেখবেন, উইন্ডশীল্ডে ধাক্কা লেগে আবার নাকটা না ভাঙে।

-ঠাট্টা করো না। রাতে আমি চোখে ভালো দেখিনা।

আভা আঁতকে উঠলো।-বলেন কি! এই কথা আগে বলেন নি কেন? তাহলে আমি ড্রাইভ করতাম। বেশী অসুবিধা হলে লাইট মেরে সামি ভাইদেরকে থামতে বলেন। রাতে ড্রাইভ করা আমার অভ্যাস আছে।

-একবার হাইওয়েতে পৌছালে আর সমস্যা হবে না।

-আর যাই করেন খাঁদেটাদে ফেলবেন না। আপনারতো আবার খাঁদ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।

-বাজে কথা বলো না। এক্সিডেন্ট যে কারো হতে পারে।

-ফাঁকা রাস্তায় উল্টেপাল্টে পড়তে জীবনে শুনিনি। আপনাকে লাইসেন্স দিয়েছে কে?

-চুপ করে থাকো।

আভার মধ্যে চুপ করবার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেলো না।

সে বললো- পার্টিতে অমন চুপচাপ ছিলেন কেন?

-আমি তো সব সময়ই চুপচাপ থাকি।

-তা জানি। লাজুক লতা। এতো চুপচাপ থাকলে কেউ আপনাকে চিনবে কি করে?

-আমাকে চিনবার দরকারটা কি? কি এমন মহাপুরুষ হয়ে গেছি আমি!

-একটা ভালো কথা বললে এতো ক্ষেপে যান কেন? তিন বছর একটা স্কুলে পড়ে এলেন, হাতে গুনে তিন থেকে চারজনের সাথে আপনার আলাপ ছিলো। ওদিকে গোলমাল করবার বেলায় বারো হাত কাকুড়ের তের হাত বীচি। প্রত্যেক সপ্তাহে এর সাথে ঝগড়া, ওর সাথে হাতাহাতি, তার সাথে ঘুষাঘুষি। কি জাতের মানুষ আপনি?

-বাড়িয়ে বলবে না। কারো সাথে ঘুষাঘুষি কখনো হয় নি।

-শার্লির পার্টিতে হয় নি? ওর ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরলে আপনার কি? আমি অবলা মেয়েলোক নাকি? কথা নেই বার্তা নেই ধাঁই করে ঘুষি বসিয়ে দিলেন। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গিয়েছিলো।

এই আলাপ চালিয়ে যাবার ইচ্ছা দীপুর নেই। সে রেডিও চালিয়ে দিলো। আভা তৎক্ষনাৎ সেটা বন্ধ করে দিলো। - প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। আমার প্রতি আপনার ফিলিংস আছে সেটা দুনিয়াশুদ্ধ মানুষ জানে। সুতরাং শার্লির ভাইয়ের ঘটনাটা বাদ দিলাম। কিন্তু আমার জানা দরকার, আমেরিকা এসে আপনার এতো মেজাজ হলো কেন? দেশে থাকতে তো কখনো ঝগড়াঝাটি, মারপিট করতে দেখিনি!

91 এর এক্সিট এসে গেছে। হাইওয়েতে উঠে অনেক স্বস্তিবোধ করলো দীপু। আভা বললো-আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন?

-উত্তর দিলেও তুমি বুঝবে না। তোমার দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা।

-থামলেন কেন? বলেন, আমি খারাপ মেয়ে। ছেলেদের সাথে হৈ চৈ, নাচানাচি করি।

-তুমি কি করো না করো তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না।

-না, ঘামান না! তাহলে আমি কার সাথে মিশছি না মিশছি জানার জন্য ঘন ঘন ইউ ম্যাস (U.Mass) এ কেন আসা হতো?

-বেশী বক্ বক্ করো তুমি।

-বাহ্ এখন আবার উল্টা ঝাড়ি দিচ্ছেন! ঠিক আছে, তাহলে এতো রাগ কার উপরে বলেন?

দীপু বিরক্তি নিয়ে বললো- তোমার উপর আমার কোন রাগ নেই।

আভা জেদ ধরে বললো - তাহলে কার উপর রাগ? এদেশের ছেলে মেয়েদের মধ্যে আপনার কোন বন্ধু নেই কেন? জন আপনাকে এতো পছন্দ করতো অথচ তার সাথেও ‘হাই’ এর উপরে একটা কথাও কখনো বলতে দেখিনি।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মতো তুষার পড়ছে। বাতাসের শরীরে ভর দিয়ে তুষারের স্ফটিকগুলোর কোমল ভঙ্গীতে নেমে আসা দেখতে খুব ভালো লাগে দীপুর। রাস্তায় ট্রাফিক তুলনামূলক কম। ওর ঠিক সামনেই সামি। সামিও সর্তক ড্রাইভার। ৬৫-র উপরে স্পীড তুলছে না সে। পাশ দিয়ে একটি লবন ফেলা গাড়ী ভোঁ ভোঁ শব্দ করে ছুটে গেলো।

দীপু বললো- বাংলাদেশে থাকতে মাইনোরিটি (minority) হয়ে কোথাও বসবাস করাটা কেমন সেটা কখনো বুঝিনি। ঢাকার রাস্তায় বাসের কন্টাক্টরের সাথে ঝগড়া হয়েছে, রিক্সাওয়ালার সাথে দর কষাকষি হয়েছে; কিন্তু জাত্যাভিমানে কেউ কখনো ঘা দেয়নি। আমেরিকা আসার পর প্রথম যে বস্তুটা আবিষ্কার করলাম সেটা হচ্ছে

আমি আর মেজোরিটি (majority) নই, আমি মাইনোরিটি, অসম্ভব রকম মাইনোরিটি। ভারতীয়রা এদেশের অফিস-আদালতে ছড়িয়ে পড়েছে ঠিকই কিন্তু তারা থাকে একপাল ভেড়ার মতো। সাদা-কালো কেউই সুযোগ পেলেই দু'টো খারাপ কথা শোনাতে ছাড়ে না। এলাকা সূত্রে আমরাও ভারতীয়। রেষ্টুরেন্টে খেতে গেছি, টিনএজারদের মন্তব্য শুনে থ হয়ে গেছি। ইউনিভার্সিটিতে যায় প্রগতিশীল ছেলেমেয়েরা। তাদের মনোভাব দেখে হতবাক হয়ে গেছি। এদের কতকগুলো খুব জনপ্রিয় ধারণার কথা তোমাকে বলি-- এক নম্বরঃ ইন্ডিয়ান মেয়েরা খুব কুৎসিৎ; সুতরাং ইন্ডিয়ান ছেলেরা এদেশের মেয়েদের দেখলে কুত্তার মতো ঘোরে। দুই নম্বরঃ ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েরা খুব নোংরা থাকে। শরীর দিয়ে গন্ধ বের হয়। ভয়ানক কঞ্জুসও বটে। তিন নম্বরঃ ইন্ডিয়ানরা মেয়েদের সম্মান দিতে জানে না। এক বন্ড হারামজাদীকে বলছিলাম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের কথা। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃত্ততম সৈকত। শুনে সে মুখ ঝাঁকিয়ে বললো - বীচ বড় হয়ে কি লাভ! সেখানে তো থাকে সব কুৎসিৎ মেয়েরা। আমার ইচ্ছা হয়েছিলো শালীর মুখে ঠাস্ করে একটা চড় বসাতে। দক্ষিণ ভারতের মেয়েদের দেখে ওরা পুরো এলাকা সম্বন্ধে হাফেজ হয়ে গেছে। এই রকম হাজার হাজার ঘটনা তোমাকে বলতে পারি। আমার সাথে আরো তিন ডজন ইন্ডিয়ান ছেলে ছিলো। তারা এসব শুনে দাঁত বের করে হাসতো। কিন্তু আমার গায়ে লাগতো। দেশের নামে একটা বাজে কথা শুনলে মাথায় রক্ত চেপে যায়। ওদের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখো! সমকামীতা, নোংরা যৌনতা, খুন-খারাবী, দারিদ্র, পিতামাতাহীন শিশুর দল। আমাদের দিকে তাকিয়ে এমন ভাব করে যেন আমরা বর্বর, জংলী অথচ ওদের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখো! দীপুর মুখ শক্ত হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো সে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো আভা স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে নীচু গলায় বললো-আমি জানি তুমি এটা বুঝবে না। অধিকাংশ মানুষই এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু ভিখারীর ছেলেমেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ অসম্ভব অহংকারী হয়। আমি তাদের একজন।

আভা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো-আপনি যে অহংকারী সেটা সবাই জানে। কিন্তু এদেশের মানুষদের সম্বন্ধে যা বললেন সেটা ঠিক না। সবাই একরকম নয়।

দীপু কঠিন গলায় বললো- এদেশের ছেলেমেয়েদের সাথে গলায় গলা মিলিয়ে নেচে গেয়ে সেই পার্থক্যটা তোমার ধরতে পারার কথা নয়।

আভা ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বললো- আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন?

দীপু নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বললো-এই সব কথা তোলাই উচিৎ হয়নি। গান শুনতে আপত্তি আছে?

আভা কোন জবাব দিলো না। তার কণ্ঠ অসম্ভব ভারী হয়ে এসেছে। সে দু'হাতে মুখ গুঁজে কান্না থামানোর চেষ্টা করতে লাগলো। দীপু তার সাথে এমনভাবে কথা বলতে পারে সেটা তার ধারণাতেও ছিলো না। দীপু রেডিও চালিয়ে দিলো। এবং কি আশ্চর্য, হুইটনি হিউষ্টনের-I'II always love you বাজছে। দীপু রেডিও বন্ধ করে দিলো। অকারণে দূর্বল হয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না। আভা এবং সে দুই জগতের মানুষ। হালকা একটু ঘাড় ঘুরিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করলো, মেয়েটা কাঁদছে কিনা। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা গেলো না। সে নিঃশব্দে ড্রাইভ করতে লাগলো। এখনো অনেকখানি পথ যেতে হবে। তুষারের বেগও যেন একটু বেড়েছে। ঝম্ঝমিয়ে না নামলেই হয়।

মার্লবোরো ছোট শহর। ফিডেলিটি ইনভেষ্টমেন্ট এবং ডিজিটালের হেডকোর্য়াটার এই শহরে। সম্ভবত সেই সুবাদেই শহরটি টিকে আছে। 495 সাউথ থেকে 20

ইষ্ট নিয়ে মার্লবোরোতে প্রবেশ করতে হয়। 20 ইষ্ট চলে গেছে পাশাপাশি অবস্থিত অনেকগুলি শহরের বুক চিরে।

হাতে গোণা কয়েকটি এপার্টমেন্ট কমপেক্স এই শহরে। উইন্ডসর হাইট্স তার মধ্যে একটি। বিশাল এলাকা জুড়ে কমপেক্স। ত্রিশ থেকে চলিশটি বহুতল বিল্ডিং, বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র বাসা, লন, টেনিস গ্রাউন্ড, সুইমিংপুল এবং চারপাশে ঘেরা পাতা ঝরা গাছের অরণ্য নিয়ে উইন্ডসর হাইট্স।

পৌঁছাতে রাত এগারটা বেজে গেলো। আভা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। দীপু তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিতেই তটস্থ ভঙ্গীতে সোজা হয়ে বসলো সে।

-গায়ে হাত দেবেন না।

-আমার বাসায় এসে গেছি।

-চারদিকে এতো বনজঙ্গল কেন? ইলেকট্রিসিটি আছে তো এখানে?

-না হারিকেনই ভরসা।

আভা মুখ বাকিয়ে বললো-তাই তো মনে হচ্ছে।

দীপু এক বেডরুমের একটি এপার্টমেন্টে থাকে। মাসে ৭০০ ডলার গুনতে হয় সেজন্য। এর চেয়ে সস্তা এপার্টমেন্ট প্রচুর রয়েছে কিন্তু সেগুলি বেশ দূরে দূরে। শীতকালে কর্মস্থল থেকে বেশী দূরে আবাস গাড়বার সাহস পায়নি সে। তার এপার্টমেন্টের অবস্থা দেখে সঙ্গী তিনজনারই চোখ কপালে উঠে গেলো। রান্নাঘরে আধোয়া থালা-বাসন-হাড়ির পাহাড় জমে আছে, লিভিংরুমে বালিশ-তোষকের ছড়াছড়ি, শেষ কবে কার্পেট পরিষ্কার করা হয়েছে সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে জোর তর্ক শুরু হয়ে গেলো। আভা বাথরুমে ঢুকেই ছিটকে বেরিয়ে এলো।-ছিঃ ছিঃ, এখানে মানুষ থাকে না পশু পাখী থাকে?

দীপু বাথরুমে ঢুকে দেখলো কমোড আবার আটকে গেছে। নোংরা পানি উঠে এসেছে সুয়োরেজ লাইন দিয়ে। বিরাট সমস্যা। মানুষজন যা ইচ্ছা ফেলে কমোডের মধ্যে। সুয়োরেজ লাইন ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যায়। কান্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে কারো? বাইরের লোকজনের সামনে মাথা কাটা যায়।

ঘন্টা দুয়েক প্রচুর গঞ্জনা সহ্য করতে হলো দীপুকে। আভাকে ক্ষ্যাপানোটা যথাযথ হয়নি। সে একটার জায়গায় দশটা কথা শুনিয়ে ছাড়ছে। ফ্রিজ ফাঁকা দেখে পিংকি এবং সামির মুখও ব্যাজার হয়ে পড়লো। দীপু গাড়ী নিয়ে বের হলো। সামনের মিনি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরটা খোলা পাওয়া যাওয়ায় এ যাত্রা রক্ষা হলো। খান তিনেক ফ্রোজেন পিজা নিয়ে এলো সে।

পিজা দেখেই অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গী করলো আভা।-ঐ সব আমি মুখেও তুলি না। পিংকিও মুখ বাঁকালো।-এ কি ছাইভস্ম এনেছো। ফ্রোজেন পিজা বেক্ করার পর মুখে দেয়া যায় না। আজকের রাতটা মনে হচ্ছে উপোসই দিতে হবে।

সামির খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোন সমস্যা নেই। সে আগুনে একটু খোঁচা দিলো-মেয়েমানুষদের নিয়ে এটাই সমস্যা। কিছুতেই তাদের মন ভরে না। বিয়ে না করে বেশ করেছেন ভাইয়া।

মেয়েমানুষ শব্দটি পিংকির কর্ণশুল। মুহূর্তে ক্ষেপে লাল হয়ে উঠলো সে। হাতের কাছে দীপুর চামড়ার জুতোটা ছিলো, সেটাই ছুড়ে মারলো। সামি কাটানোর সুযোগ পেলো না। তার বুকের উপর ঠাস করে পড়লো নিরীহ জুতা বেচারী। সামি এই আঘাতে যথেষ্ট উৎফুল হয়ে উঠলো। সে জুতাটিকে ফেরত পাঠিয়ে দিলো। শুরু হয়ে গেলা পাদুকা যুদ্ধ। দীপুর ছ' জোড়া জুতার একেক পাটি এক এক দিকে

ছিটকিয়ে পড়েছে। সে অসহায় ভঙ্গীতে বললো-আরে, এসব হচ্ছে কি? আভা অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই ভয়াবহ রকম উপভোগ করছে। হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে।

শেষ পর্যন্ত শান্তির শ্বেত পতাকা উড়লো। ঠান্ডা পিজা বেক্ করা হলো ওভেনে। পিংকি এবং আভা কারোরই সেই বস্তুতে অরুচি আছে বলে মনে হলো না। দীপু মনে মনে ক্ষুদ্ধ হলো। সেই খাচ্ছে মাঝখান দিয়ে তার জুতাগুলো হেনস্থা হলো। অফিসে যাবার কালো জুতাজোড়ার এক পাটি কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে কে জানে? রাত আড়াইটায় শোয়ার আয়োজন করা গেলো। দীপু শয্যা নেবার আগে ভদ্র কণ্ঠে হুমকি দিলো-কাল ঘুম থেকে উঠে যদি আমার জুতা জায়গা মতো না দেখি, বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে।

কথাটা সম্ভবত ঠাট্টার মতো শোনালো, কারণ বেশ একটা হাসির ধুম পড়ে গেলো। দীপু সেই হাসিতে যোগ দিতে পারলো না। অফিসের জুতা নিয়ে ফাজলামী চলে না। ছিঃ ছিঃ।

১০

সকাল থেকেই টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ইলশে-গুড়ি। আকাশ মেঘলা। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ইঞ্চিখানেক তুষার পড়বার আভাস দেয়া হয়েছে। ঘন্টাখানেকের পথ স্যালেম। আভা এখনো রহস্য ভাঙেনি। সবাই ধরে নিয়েছে সেখানে তার পরিচিত কেউ থাকে। লং ড্রাইভে যাওয়াটা সবারই পছন্দ। সুতরাং কারণ নিয়ে কেউই বিশেষ বিচলিত নয়। গত গ্রীষ্মে এই এলাকা চষে বেড়িয়েছে দীপু, পিংকি এবং সামি। নায়েগ্রা আট ঘন্টার ড্রাইভ। একটানা ড্রাইভ করে গেছে দীপু। প্রথম দর্শণে নায়েগ্রা জলপ্রপাতকে কল্পনায় আঁকা ছবির চেয়ে অনেক ম্রিয়মান মনে হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে যতই সেই বিশাল জলধির কাছাকাছি এসেছে ততই যেন তার বিশালত্ব, গর্জন এবং সৌন্দর্য গ্রাস করেছে ওকে। বিশাল একটি অশ্বখুরের আকৃতি নিয়ে বিপুল বেগে গড়িয়ে নামছে জলধারা, ঝাঁপিয়ে পড়ছে দুই'শ ফুট নীচের সরোবরে। খুরের মধ্যবর্তী এলাকা জলীয় বাষ্পে সর্বক্ষণ ঘোলা হয়ে আছে। একটির পর একটি ফেরী ছাড়ছে ঘাট থেকে, খুরের ভেতরে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গভীরে গিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে দর্শকদেরকে সেই অবিশ্বাস্য জলপ্রপাতটিকে খুবকাছ থেকে অবলোকন করবার সুযোগ দেয়া হয়।

প্রচন্ড বেগে ধেয়ে আসা জলের ঝাপটায় প্রায় কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু তারপরও সেই অনুভূতির তুলনা চলে না। অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

যাবার পথে অফিসে থামলো দীপু। ইদানিং প্রচুর ব্যস্ততা যাচ্ছে। অধিকাংশ কর্মীরাই ছুটির দিনে এসে কাজ করে। শুক্রবারে হাফ ডে নিয়েছিলো সে, শনিবারে আসবার কথা ছিলো তার। আভার চাপে গুলপট্টি মারতে হয়েছে। রোজমেরী নিঃসন্দেহে এসে হাজির হয়েছে। প্রতিদিনই আপার ম্যানেজমেন্টের সাথে একাধিক মিটিং থাকে তার। সে জন্যে পূর্ব প্রস্তুতি নেয়াটা তার জন্য জরুরী। প্রায় প্রতিটি ছুটির দিনেই অফিসে চলে আসে সে। আগামী মিটিংগুলির প্রেজেন্টেশনের উপরে কাজ করে। প্রেজেন্টেশন একটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখানে। নিখুঁত প্রেজেন্টেশনের উপর অনেক প্রজেক্টেরই ভবিষ্যত নির্ভর করে।

রোজমেরীকে তার অফিসেই পাওয়া গেল। দরজায় দু'বার টোকা দিলো দীপু। মহিলা পিছু ফিরে তাকে দেখেই মুচকি হাসি দিল।

-তা, হোটেলে কেমন কাটলো?

- রোজমেরী, তুমি যা ভাবছো সেটা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়।

- তা তো বটেই। আমি তো সবসময় মন্দ কথা ভাবি। ঠিক কিনা?

- আমি মোটেও তা বলিনি।

-তোমার সেই দুঃসম্পর্কের বোনটিকে কোথায় রেখে এলে?

-স্যালেমে তার আত্মীয় থাকে। সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি তাকে।

-আগেই বুঝেছি এতো সেজেগুজে কাজ করতে আসা হয়নি।

দীপু আকাশ থেকে পড়লো। -সাজ গোজটা কোথায় দেখলে! জিনস্ আর শার্ট পরেছি।

রোজমেরী মুখ বাঁকালো।- হয়েছে! এই দুঃসম্পর্কের বোনগুলো খুব সমস্যা করে দেখছি। তোমার কাজগুলো শেষ করবে কে শুনি?

দীপু মনে মনে হিসেব কষলো।-ঘন্টা তিনেক সময় পেলেই চলবে আমার।

আজা রাতে এসে শেষ করে ফেলবো।

রোজমেরী চোখ শাসালো। - ঠিক তো?

-আলার কসম।

মহিলা হেসে ফেললো। -যাও ভাগো। রাতে এসে কিন্তু ওগুলো শেষ করবে। আমার রিপোর্টে আমি লিখে দিচ্ছি ওটা শেষ হয়েছে। আমার মুখ রক্ষা করো।

- কিছু চিন্তা করো না। যতো রাতই হোক ওটা আমি শেষ করবই।

রোজমেরী তার টাইপিং-এ ফিরে গেলো।- সাবধানে ড্রাইভ করো। রাস্তা ভেজা থাকবে।

দীপু ছিটকে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। মহিলার মন পরিবর্তন হবার সুযোগ না দেয়াটা খুবই জরুরী। যদিও দীপুর উপরে তার যথেষ্ট আস্থা আছে। দীপু পেছনের গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ফিডেলিটি ইনভেষ্টমেন্টের হেড অফিস। পাশাপাশি দু'টি বিশাল আকৃতির দালান। অসংখ্য পাইন আর পাতামরা গাছের অরণ্য ঘিরে আছে এলাকাটিকে। পাইন হচ্ছে চিরসবুজ গোত্রের। শীতকালেও তাদের প্রগাঢ় সবুজ পাতার বহর নিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। পাইনের অবশ্য প্রচুর গোত্র আছে। সবগুলি খুব লম্বা হয় না।

পাইনের ঘন বনটির ঠিক শরীর ঘেঁষে পার্কিং লট। ওপাশে ঢালু হয়ে নেমে গেছে রাস্তা। রাস্তার বিপরীতে ছোট কয়েকটি পাহাড়ের শরীরে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর খয়েরী পত্রহীন বৃক্ষের কান্ড। হালকা বৃষ্টির ফোঁটাগুলি এখন তুষারের রূপ নিয়েছে। বাতাসটাও বেশ ঠান্ডা হয়ে উঠছে। দীপুর সঙ্গী তিনজন অসহিষ্ণুভঙ্গীতে গাড়ীর ভেতরে বসেছিলো। দীপুকে দেখেই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো তারা। দীপু কানে হাত চাপা দিলো। গাড়ীর ইঞ্জিন চালুই ছিলো। ভোস্ করে ছুটে গেলো সেটি। পুরিটাস রোড ধরে 20 ওয়েষ্ট। সেখান থেকে 495 সাউথ রোড ধরে 95 নর্থ। স্যালেমে দীপু আগে কখনো যায়নি। কিন্তু সাথে ম্যাপ থাকলে চিন্তার কিছু থাকে না। এদের রাস্তাঘাট সুপরিকল্পিত হওয়ায় পথ চিনে নিতে বিশেষ সমস্যা হয় না। 495 এ নেমেই গাড়ীর স্পীড ৮০ তে নিয়ে এলো দীপু।

ওরা যখন স্যালেমে পৌঁছলো তখন ঝরঝরিয়ে তুষার পড়ছে। রাস্তাঘাট ফর্সা ধবধবে হয়ে গেছে। ছোট্ট শহর স্যালেম। প্রাচীন শহর। ডাকিনীবিদ্যার জন্য বিখ্যাত। একসময় ডাকিনীদের ধরে ধরে পুড়িয়ে মারা হয়েছে এখানে। আভা এখনো রহস্য ভাঙেনি। প্রচুর সাধ্য সাধনা করেও তার মুখ থেকে কিছু বের করা যায়নি। কিন্তু স্যালেমের যতই নিকটবর্তী হয়েছে ওরা ততই গম্ভীর হয়ে পড়েছে মেয়েটি। দীপু মনে মনে যথেষ্ট আশ্চর্য হয়েছে। আভার এই রূপ সে বিশেষ একটা দেখেনি। সাধারণত বেড়াতে বের হলে আভার ছটফটানি তার বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্যালেমের সীমানায় গাড়ী ঢুকিয়ে আভার দিকে তাকালো দীপু। -মহারাণী, এবার কোনদিকে?

আভা দ্বিধান্বিত ভঙ্গীতে বললো-জানি না। কোথাও গাড়ী থামান। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

-কি জিজ্ঞেস করতে হবে?

-জিজ্ঞেস করবেন শীলা ম্যাকনীলকে কোথায় পাওয়া যাবে।

-শীলা ম্যাকনীল কে?

আভা থম্থমে মুখে বললো - উইচ।

পিংকি এবং সামি একযোগে কঁকিয়ে উঠলো-কি?

দীপু একটা বিশাল ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের পার্কিং লটে গাড়ী পার্ক করলো-আভা, এটা ঠাট্টা না সিরিয়াস?

ভ্রু কুঁচকে তাকালো আভা-আমার সবকিছু আপনার কাছে ঠাট্টা মনে হয় নাকি?

আমাকে এতো ছোট করে দেখেন কেন আপনি?

-ফালতু আলাপ রাখো। এই শীলা ম্যাকনীল কে?

-বললাম তো। একজন উইচ।

পিংকি ফ্যাকাশে মুখে বললো -হঠাৎ উইচ এর খোঁজ করছো কেন তুমি? সেদিনই কাগজে পড়লাম দু'জন হাই স্কুলের মেয়ে একজন আরেকজনের রক্ত খেতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তুমি আবার সেইসব করছো না তো?

আভা গম্ভীর মুখে বললো-এই ভদ্রমহিলাকে বেশ কয়েকবার টিভিতে দেখেছি। পুলিশের সাথে কাজ করেন। তার অনেক ভবিষ্যৎবাণী ফলে গেছে। সেদিন দেখালো, পুলিশ একটি ডেড বডি কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলো না। তারা এই মহিলার কাছে সাহায্য চায়। তিনি বললেন, অমুক বনের ভেতরে যে ঝর্ণাটি আছে তার

মাঝামাঝিতে কোথাও একটি ভেঙ্গে যাওয়া গাছের গুঁড়িতে আটকে আছে শরীরটা এবং কি আশ্চর্য, পুলিশ ঠিক সেখানেই লাশটা পেয়েছে। চিন্তা করা যায়?

দীপু সন্দিহান মুখে বললো-এই মহিলার সাথে তোমার দরকারটা কি?

আভা বিড়বিড়িয়ে বললো-ভাইয়ার কোন খোঁজ কিন্তু আজও পাওয়া যায় নি।

মুহূর্তের মধ্যে গভীর নিঃশব্দ নেমে এলো। নীরবতা ভাঙলো দীপু-এই কথা তোমার আগেই বলা উচিৎ ছিলো। অযথা কতকগুলো কড়া কথা শোনালাম তোমাকে।

আভা নরম গলায় বললো-আপনার কথায় আমি কিছু মনে করি না। চলেন, এই ষ্টোরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি কেউ বলতে পারে কিনা। ছোট শহরে অধিকাংশ মানুষেরই মহিলাকে চেনার কথা।

সামি এবং পিংকি গাড়ীতেই বসে থাকলো। পিংকি সামান্য তেলাপোকা দেখলেও দশ হাত দূর থেকে লাফ ঝাঁপ শুরু করে। তার আতংক ঢেকে রাখতে বিশেষ সক্ষম হচ্ছে না সে।

ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে ঢুকে জনা দুয়েক বয়সী কর্মীকে জিজ্ঞেস করলো দীপু। তাদেরকে এই বিষয়ে বিশেষ ওয়াকিবহাল মনে হলো না। বাকী কর্মীদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ। তাদের জিজ্ঞেস করবার বিশেষ আগ্রহ দেখালো না আভা। বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। আভা বললো-পুলিশ ষ্টেশনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে ওরা নিশ্চয় বলতে পারবে।

ষ্টোর সংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দার এক কোণায় দাঁড়িয়ে বেশ আয়েসে সিগ্রেট ফুঁকছে পক্ককেশ এক বুড়ো। দীপু বললো- দেখি, এই লোকটা কিছু বলতে পারে কিনা। তুমি গাড়ীতে গিয়ে বসো।

-আমিও আপনার সাথে আসি?

- কেন? আমাকে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

- কি বাজে কথা বলেন? আভা তুষার ভেঙে এক দৌড়ে গাড়ীতে গিয়ে বসলো। তার দৃষ্টি অনুসরণ করছে দীপুকে।

দীপু একটি সিগ্রেট ধরিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে বুড়োর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ঝট্ করে একজন উইচ এর কথা জিজ্ঞেস করাটা কতখানি শোভন সেটা সে ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না। আগে দু'জন কর্মীকে মহিলার পরিচয় দিয়েছে সাইকিক হিসাবে। আমেরিকায় এখন সাইকিক ব্যবসা রমরমা। তাদের গন্ডা গন্ডা সংগঠন আছে। কাগজে, টিভিতে, পত্রপত্রিকায় বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ নাম্বারে ফোন করতে হয়। মিনিটে ২ ডলার থেকে ৪ ডলারের মধ্যে খরচ। দীপুর মত অনযায়ী এরা বিশ্ব ভুয়া। উইচদের সম্বন্ধে বিশেষ একটা জানে না সে।

বুড়োই আলাপ শুরু করলো।-আবার শুরু হলো। গতকালও টিপ্ টিপ্ করে সারাদিন পড়েছে। আর ভালাগে না।

দীপু ঘাড় দোলালো।-ঠিক বলেছো। একবার শুরু হলে আর থামতেই চায় না। তুষারের মধ্যে ড্রাইভ করতে অসহ্য লাগে।

-কোথেকে এসেছো তোমরা?

-মার্লবোরো থেকে। এক মহিলাকে খুঁজতে এসেছি। মাঝে মাঝে টিভিতে আসেন তিনি। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম কেউ কিছু বলতে পারলো না।

-কি নাম তার?

-শীলা ম্যাকনীল ।

-উইচ ?

-হ্যাঁ । চেনো নাকি তুমি ।

-না চিনি না । তবে তার উইচ ক্রাফ্‌ট (Witch craft) এর দোকানটা চিনি । খুব নামী মহিলা । সে দিন তো টিভিতে দেখলাম তাকে ।

-তার দোকানটা কোন দিকে? এখন গেলে তাকে পাওয়া যাবে মনে হয়?

-পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারবো না । কিন্তু স্যালেম স্কোয়ারে গেলে দেখবে পর পর বেশ কতগুলি উইচ ক্রাফ্‌ট এর দোকান আছে । শীলা ম্যাকনীল ছাড়াও আরো বেশ কয়েকজন আছে । তারাও টিভিতে আসে ।

বুড়ো দিক নির্দেশনায় বিশেষ রকম ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিলো । স্যালেম স্কোয়ারটা খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হলো না দীপুর । জালের মতো ছড়ানো রাস্তার দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে নানান ধরনের দোকান । অধিকাংশই আজ বন্ধ । একটি জুতার দোকান খোলা পাওয়া গেলো । বয়সী দোকানী নাম শুনেই বললো - সোজা সিকি মাইল গেলেই হাতের ডানে দোকানটা দেখতে পাবে । বাকক্যাট । ভুল হবার কোন উপায় নেই । তবে গাড়ী নিয়ে যেতে পারবে না । গাড়ী রাস্তার পাশে পার্ক করে হেঁটে চলে যাও ।

রাস্তার দু'পাশেই সারি বেঁধে পার্ক করা অজস্র গাড়ী । তার মধ্যেই ফাঁক খুঁজে পার্ক করলো দীপু । তুষারের বেগ আরো বেড়েছে । পিংকি বললো- আমি এখানে থাকি । এই ঠান্ডায় আর হাঁটতে ইচ্ছা করছে না ।

তার থাকতে চাইবার কারণটা বেশ স্পষ্ট । এই সব ভীতিকর ব্যাপারে সে নিজেকে জড়াতে রাজী নয় । তার কথায় অবশ্য কেউ কর্ণপাত করলো না । অপরিচিত একটি শহরে একটি মেয়েকে পিছু ফেলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না । স্কোয়ারে মানুষ জন প্রায় কেউ নেই বললেই চলে । কংক্রিটের চাতালে তুষার জমে বরফ হয়ে গেছে । সতর্ক হয়ে হাঁটতে হচ্ছে ওদেরকে । অচিরেই সবার মাথার উপরে আধ ইঞ্চি তুষারের প্রলেপ পড়ে গেলো । দীপু ঘন ঘন চশমা মুছ্ছে । আভা তার শরীর ঘেঁষে হাঁটছে । মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে আলতো মোচড় অনুভব করছে দীপু । আভাকে দেখে তার একবারও মনে হয় নি একমাত্র ভাইকে হারানোর দুঃখ সে আজও সঙ্গোপনে লালন করে চলেছে । খুব সম্ভবত এই জন্যেই দীপুর এখানে এসেছে সে । দীপু রীতিমতো লজ্জিত হয়ে পড়লো । গত দু'দিনে কত কি আবোল তাবোল ভেবেছে সে ।

খুব চিকণ একটি দরজা পেরিয়ে ঢুকতে হয় দোকানের ভেতরে। পিংকিকে বাক ক্যাটের ভেতরে ঢোকানোর জন্য সামিকে রীতিমতো দড়ি টানাটানি খেলতো হলো। ধুপ জাতীয় কিছুর গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। অপ্রশস্ত। ছোট ছোট তাকে থরে থরে সাজানো নানান জাতের বস্তু, অধিকাংশই নিরীহ দর্শন। মুখোশ, মূর্তি, রং বেরঙের পাথর, মালা-এমনি হাজারো জিনিষ। দোকানী দু'জনার পরনে ড্রাকুলার আলখেলা, মুখে সযত্ন পরিচর্যার ছাপ। তাদেরকে দেখে বিশেষ ভীতিকর কিছু মনে হলো না। দু'জনাই দোকান ভর্তি খদ্দেরদের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। সম্ভবত এই হাসি দেখেই পিংকির ভয় ছুটে গেলো। উপযাচক হয়ে সেই প্রশ্ন ছুড়লো- আমরা শীলা ম্যাকনীলকে খুঁজছি। এখানে আছেন তিনি?

খাটো মতন দোকানীটি ঘাড় নাড়লো।- বেশ কয়েকদিন হলো তার ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে। আগামী সপ্তাহেও এখানে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই তার।

আভা বললো- তার বাসার ঠিকানা দেবে? আমি ডালাস থেকে এসেছি তার সাথে দেখা করবো বলে।

- শীলা এই শহরে থাকেন না। তার বাসার ঠিকানা দেয়াটা সম্ভব নয়। তার সাথে দেখা করতে হলে আগে থেকে এপয়েন্টমেন্ট করতে হবে তোমাকে।

আভার দু'চোখ ছল ছল হয়ে পড়লো। - এতো দূর থেকে এলাম, দেখা হবে না।

দোকানী বিমূঢ় মুখে বললো- দেখা হবার তো কোন উপায় দেখছি না আমি। তবে তোমরা ওর মেয়ের বইয়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ নিতে পারো। সোজা দু'বক গিয়ে ডানে মোড় নিলে বাঁ হাতে পড়বে দোকানটা। আইডিয়াল বুক ষ্টোর, বেগুনী রঙের দরজা। ওনার মেয়েও উইচ; সে হয়তো তোমাদের সাহায্য করতে পারবে।

দোকানীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। আবার তুষার ভেঙে এগিয়ে চলা। বাতাসের জোর বেড়েছে। ঠান্ডাটা অনেক বেশী অনুভূত হচ্ছে এখন। কেউই দস্তানা নিয়ে আসেনি ওরা। এতোখানি ঠান্ডা পড়বে সেটা ঠিক আন্দাজ করা যায় নি। পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়েও বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না। পিংকির ঝট্ করে ঠান্ডা লেগে যাবার বাতিক আছে। সামি তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। আভা শরীর কুঁচকে হাঁটছে। বাতাসের তীক্ষ্ণ শুল থেকে যতখানি রক্ষা পাওয়া যায়। দীপু বললো- আমার জ্যাকেটটা নেবে?

আভা ধমক দিলো- আমি আপনার জ্যাকেটটা গায়ে দেই আর আপনি ঠান্ডায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকুন! আমাকে কি অমানুষ ভাবেন নাকি?

-তোমার শীত করছে দেখেই বললাম।

-আমাকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না।

দীপু পিছু ফিরে দেখলো সামি এবং পিংকি বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। সে আভাকে লক্ষ্য করে বললো- আমার আরো কাছাকাছি চলো এসো। তাতে বাতাসের ধাক্কাটা কম লাগবে।

আভা তার চোখে চোখ রাখলো। কোমল স্বরে বললো-দীপু ভাই, আপনি আমাকে ভালবাসেন?

দীপু চোখ ফিরিয়ে নিলো। চশমাটা আবার তুষারে ঢেকে গেছে। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগলো। আভা অনেকখানি

ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো। তার বাহুতে বাহু সেঁটে আছে। সে নীচু গলায় বললো-আজ পর্যন্ত অজস্রবার অসংখ্য ছেলের মুখে ভালোবাসার কথা শুনেছি। কিন্তু যে মানুষগুলি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে তারা কখনো সেটা জানানোর প্রয়োজনও মনে করে না। বারো বছর বয়সে একটা ছেলেমানুষী চিঠি পেয়ে খুব হৈ চৈ করেছিলাম। কিই বা বুঝতাম তখন? যখন বোঝার বয়স হলো তখন এই কথাটা একজনের মুখ থেকে শুনবার জন্য পাগল হয়ে থেকেছি, কিন্তু সেই সৌভাগ্য আমার হলো না। অভিমানী মানুষদের জন্য এই দুনিয়া নয়। জোর গলায় না চাইলে কিছুই পাওয়া যায় না।

দীপু গম্ভীর মুখে বললো- এখন আর এসব কথা তুলে লাভ নেই।

পিংকিরা মাঝের দূরত্ব কমানোর শেষ চেষ্টা হিসাবে টেনে দৌড় শুরু করেছে। বরফ কাটিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে দৌড়ে আসছে তারা। দীপু চিৎকার করে বললো- দৌড়াস না। পড়ে যাবি।

মনে হলো তাদের দু'জনারই বেশ ফুর্তি লেগেছে। দীপুর কথায় কেউ কান দিলো না। একজন আরেকজনকে ধাওয়া করে এগিয়ে আসছে। আছাড় খেতে বিশেষ বিলম্ব হলো না। বরফে পা পিছলে দু'জনই চিৎপটাং হয়ে পড়লো। তাতে অবশ্য তাদের আনন্দের বিশেষ হেরফের হলো না। হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাচ্ছে দু'জন। তাদেরকে ধাতস্থ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো দীপুকে।

আইডিয়াল বুক ষ্টোর খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। প্রগাঢ় বেগুনী রঙের দরজা বিশেষ একটা চোখে পড়ে না। সুতরাং বেশ দূর থেকেই ষ্টোরটি সনাক্ত করা গেছে। বেগুনী দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একই ধরনের গন্ধ পাওয়া গেলো। এই দোকানটা বেশ প্রশস্ত। অসংখ্য বই সযত্নে সাজিয়ে রাখা। বাক আর্টের উপরে লেখা বই। প্রচ্ছদগুলি দৃষ্টিকাড়া। দু'টি কম বয়সী মেয়ে কাজ করছে কাউন্টারে। দু'জনারই নাকে, ঠোঁটে, কানে ভুরি ভুরি রিং। এই একটা নতুন হুজুগ এদেশী টিনএজারদের। শরীরের যত্রতত্র ছিদ্র করে রিং ঝুলিয়ে দেয়। এতে যে কি আনন্দ হয় আলাহ মালুম। মেয়ে দুটিকে শীলার কথা জিজ্ঞেস করতেই একটি ছাপানো কাগজ বাড়িয়ে দিলো তারা। শীলা ম্যাকনীলের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব তার সবিস্তার বর্ণনা। একটি ঠিকানা দেয়া আছে। পোষ্ট অফিস বক্স এবং একটি ফোন নাম্বার। পাশে উলেখ করা হয়েছে এই নাম্বারে তাকে পাওয়া যাবে না। সুতরাং যোগাযোগের উপায় মোটের উপরে একটিই। পোষ্ট বক্স এর নামে একটি চিঠি ছুড়ে দেয়া। সেই চিঠি পেয়ে মহিলার নিজেরই যোগাযোগ করবার কথা। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বেরিয়ে এলো দীপুরা। শীলার মেয়েকেও পাওয়া গেলো না। কাউন্টারের মেয়ে দু'টিকে সাধ্য সাধনা করেও কারো ঠিকানা পাওয়া যায় নি। ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেই তারা বোবা হয়ে যায়। এতো সর্তকতার কারণটা বোঝা গেলো না।

আভা শুকনো মুখে বললো-কপালটাই খারাপ। আমি যখন এলাম তখনই মহিলার ব্রঙ্কাইটিস হলো।

দীপু বললো- শীতকালে ব্রঙ্কাইটিস হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। একটা চিঠি লিখে দাও, তোমার ফ্লাইটের আগে যদি উত্তর আসে তাহলে আবার চলে আসা সম্ভব।

আভা বিশেষ আগ্রহ দেখালো না।-এই সব চিঠিপত্রের ব্যাপার আমার পছন্দ হয় না। ঐ চিঠির উত্তর পেতেই সপ্তাহ পেরিয়ে যাবে। চলেন দেখি, এদিকে আর কেউ

আছে কিনা। ব্যাক ক্যাটের কাছাকাছি আরেকটা দোকান দেখেছিলাম। ওখানে গেলে হয়তো কাউকে পাওয়া যেতে পারে।

আভার গভীর আগ্রহ দেখে কেউ বিশেষ আপত্তি করলো না। যদিও এই ঠান্ডায় সকলেরই নাজুক অবস্থা। আভার সম্ভবত জেদ চেপে গেছে। সে বড় বড় পদক্ষেপে সবার আগে হাঁটছে। দীপু তার পাশে চলে এলো। - এতো মন খারাপ করো না। শীলা ম্যাকনীলের সাথে দেখা হলেই তো আর সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো না।

আভা গাঢ় স্বরে বললো- সমস্যাটা আপনি বুঝবেন না দীপু ভাই। দেড় বছর হলো কোন খবর নেই ভাইয়ার। সবাই ধারণা করছে সে মারা গেছে; কিন্তু হাজার খুঁজেও ঘটনাস্থলে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় নি। এটা যে কি যন্ত্রণার ব্যাপার। সব সময় মনের মধ্যে একটা মিথ্যে আশা ঝুলে থাকে। গত সামারে দেশে গিয়ে মায়ের অবস্থা দেখে কেঁদে ভাসিয়েছি। ভাইয়ার ঘর গুছিয়ে রেখেছে, আলমারীতে জামা কাপড় ইস্ত্রি করা। সবাইকে বলছে, আনিস আজ হোক কাল হোক ঠিকই ফিরে আসবে। প্রত্যেকদিন রাতে ভাইয়ার ঘরে ঢুকে পাগলের মতো কাঁদে মা। ঐ দৃশ্য যে দেখেছে তার মনের শান্তি চলে গেছে। এখন অবস্থা এমন হয়েছে, ভাইয়ার লাশটা দেখলেই যেন শান্তি হয়।

আভার চোখ ভিজে উঠেছে। সে হাত দিয়ে চোখ মুছলো।

দীপু বললো- পুলিশ তদন্ত করে কিছুই পেলো না?

-পুলিশ চেষ্টা করেছে। ভাইয়ার যে বন্ধু ওর জামা কাপড় ফেরতে দিতে এসেছিলো তাকেও জেরা করেছে; কিন্তু কিছুই জানতে পারেনি। তার বাবাও প্রচুর প্রভাবশালী। সুতরাং বেশী চাপাচাপি করাটা সম্ভব হয় নি। বুড়ীগঙ্গার যেখানটাতে ওরা গোছল করতে গিয়েছিলো সেখানে আঁতিপাঁতি করে খোঁজা হয়েছে। কিছুই পাওয়া যায় নি। আমার বিশ্বাস হয় না ভাইয়া পানিতে ডুবে মারা যাবে। তুখোড় সাতারু ছিলো ও।

দীপু নিরব থাকলো। আনিসের মৃত্যুটা বাস্তবিকই রহস্যময়! মৃতদেহ পাওয়া না গেলেও মোটামুটিভাবে সবাই নিশ্চিত তার মৃত্যু সম্বন্ধে। ঘনিষ্ট বন্ধুর জন্মদিন পালন করতে গিয়েছিলো আনিস। যতদূর জানা গেছে, সেই রাতে তারা প্রচুর হৈ চৈ করেছিলো। মাদক দ্রব্যের উপস্থিতি থাকাটাই স্বাভাবিক। রাত দু'টার দিকে পাঁচজনের দলটি যায় বুড়ীগঙ্গায়। সেখানে গিয়ে হঠাৎ সাঁতার কাটবার শখ হয় তাদের। পাঁচজনাই নামে পানিতে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আনিসের কোন হদিস পাওয়া যায় না। যে ছেলেটির জন্মদিন পালন করা হচ্ছিলো তার নাম সুজন। পর দিন সকালে বাসায় এসে আনিসের জামা কাপড় ফেরত দিয়ে যায় সে। আনিসের শার্ট এবং প্যান্ট দেখে কোন রকম সন্দেহ উদয় হবার প্রশ্ন ছিলো না। দেখেই বোঝা গিয়েছিলো সেগুলি সযত্নে খুলে ভাঁজ করে রাখা হয়েছিলো। বুড়ীগঙ্গার সেই বিশেষ এলাকাটি আঁতিপাঁতি করে খোঁজা হলো। আনিসের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। দেড় বছর পেরিয়ে গেছে তার পরে। ভাবাই যায় না। আনিসের কথা সম্ভবত তার একবারও মনে পড়ে নি! দীপুর নিজেকে রীতিমতো অপরাধী মনে হতে থাকে।

ব্যাক ক্যাটের পাশের বকেই পাওয়া গেলো আরেকটি উইচ ক্রাফ্‌ট এর দোকান। এটির বেশ রোমান্টিক নাম- ফুল মুন। ভেতরে ঢুকেই একই ধরণের জিনিষপত্রই চোখে পড়লো। কাউন্টারের পেছনে দু'জন বয়সী মহিলা দাঁড়িয়েছিলো। প্রথমজনার বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। শ্বেতাঙ্গিনী। কাঁধ সমান কোঁকড়ানো

সোনালী চুল। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। আভা মহিলাকে দেখেই ফিসফিসিয়ে উঠলো- একেও আমি টিভিতে দেখেছি।

মহিলার সাথে কিভাবে আলাপ শুরু করবে সেটি নিয়ে বিশেষ রকম দ্বিধায় পড়ে গেলো তারা। ভদ্রমহিলা নিজেই উপযাচক হয়ে এগিয়ে এলো।

- আমার নাম ক্যাথি ম্যাকনামারা। আমি একজন উইচ্‌। তোমাদের দেখেই বুঝেছি কোন একটি সমস্যার সমাধান খুঁজছো তোমরা। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তা হলে মন খুলে কথা বলতে পারো আমার সাথে। আমি তোমাদের সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

আভা কাঁপা গলায় বললো- আমার ভাই নদীতে গোছল করতে গিয়ে উধাও হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত সে ফিরে আসে নি, তার মৃতদেহও পাওয়া যায় নি। দেড় বছর হয়ে গেছে। তার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে তুমি?

ক্যাথি ম্যাকনামারার মুখে স্পষ্ট সমবেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলো। সে নরম কণ্ঠে বললো- আমি নিশ্চয় চেষ্টা করবো। দূর্ঘটনাটি কি এই দেশে ঘটেছে?

- না বাংলাদেশে। ইন্ডিয়ার প্রতিবেশী দেশ। কখনো নাম শুনেছো তুমি?

ক্যাথি হাঁ সূচক মাথা নাড়লো।- হ্যাঁ শুনেছি। ওখানে প্রচুর বন্যা হয়। টিভিতে দেখেছি। খুব গরীব দেশ। আমার কথায় কিছু নিও না। আমি খুব বেশী কিছু জানি না। কিন্তু আমার ধারণা যদি ভুল না হয় দেশটি পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে অবস্থিত। এতো দূর থেকে আমি কতখানি সাহায্য করতে পারবো জানি না। কিন্তু আমি চেষ্টার কোন কমতি করবো না। তুমি কি তোমার ভাইয়ের ব্যবহার্য জিনিষপত্র কিছু এনেছো? যেমন ধরো রুমাল, নিজের হাতে লেখা চিঠি, এমন কিছু যাতে তার হাতের ছোঁয়া আছে?

আভা নিরাশ ভঙ্গীতে মাথা দোলালো।- আমার কাছে সে সব কিছুই নেই। তবে দেশে আছে। দরকার হলে আমি দেশ থেকে আনাতে পারি। কিন্তু তাতে সপ্তাহ খানেক লেগে যাবে।

ক্যাথিকে চিন্তিত মনে হলো। - তার স্পর্শ আছে এমন কোন বস্তু পেলে আমার বলতে সুবিধা হতো। কিন্তু তোমার কাছে যেহেতু তেমন কিছু নেই, আমি একটু সমস্যাতেই পড়ে যাবো।

আভা তার পার্স থেকে দ্রুতহাতে দুটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি বের করলো।

-আমার ভাইয়ের ছবি আছে আমার কাছে। তাতে কি কোন সুবিধা হবে?

ক্যাথি আগ্রহ ভরে আনিসের ছবিটি হাতে তুলে নিলো। -নিশ্চয়। একেবারে কিছুই না থাকার চেয়ে ছবি থাকা ভালো। অন্য ছবিটি কার?

-এই ছেলেটির নাম সুজন। সে আমার ভাইয়ের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। আমার ভাইয়ের জামা কাপড় সেই আমাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে যায়।

ক্যাথি সুজনের ছবিটিও যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলো। তার পেছনে আরো দুজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গী মহিলাটিও গভীর মনোযোগ দিয়ে ছবি দুটি পরখ করছে। দীপু দোকানের প্রবেশ মুখে ভদ্রলোক দুজনকে ইজি চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিলো। তারা নিজেদের পরিচয় না দিলেও সে ধরে নিলো, এরা সম্ভবত ক্যাথির সহকর্মী। আভাকে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে। সামি অসম্ভব কৌতুহল নিয়ে ক্যাথিকে পর্যবেক্ষণ করছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, পিংকি এই ব্যাপারে আগ্রহী মনে হলো না। সে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকলেও পাশেই রাখা দুটি পাত্রের রং বেরঙের পাথরে তার দৃষ্টি। নিজের বোনকে দীপু ভালোভাবেই চেনে।

দেখতে হালকা পাতলা হলেও অসম্ভব মানসিক জোর তার। বুজরুকির প্রতি তার আগ্রহ বিশেষ প্রগাঢ় নয়।

আনিসের ছবিটির দিকে একটানা তাকিয়ে ছিলো ক্যাথি। ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এলো, দু' চোখ আলতো করে বুজে গেলো, খুব শথ গতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে তার। তার সহকর্মী ভদ্রলোক দু'জনার একজন ছয় ফুটের উপরে লম্বা, মাথায় বিস্তীর্ন চর। অন্যজন মাঝারী সাইজের, মাথা ভর্তি চুল। চমৎকার যোগাযোগ! তাদের নাম জানা যায় নি। লম্বা লোকটি ক্যাথিকে লক্ষ্য করে বললো-কিছু দেখতে পাচ্ছো ক্যাথি?

ক্যাথি দ্বিধান্বিত ভঙ্গীতে বাতাসে দু'হাত দুলিয়ে চাঁপা কণ্ঠে বললো-হ্যাঁ, আমি একটা নদী দেখতে পাচ্ছি। খুব বড় নদী-গভীর।

খাটো লোকটি প্রথমে দীপু এবং পরে আভার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো-নদীটি কি খুব গভীর?

সামি এবং আভা একযোগে বললো-হ্যাঁ। বেশ গভীর। পঞ্চাশ-ষাট ফুট তো হবেই।

ক্যাথি এখনও চোখ বুজে আছে। তার কপালে চিন্তার রেখা। সে বললো-নদীর তলায় প্রচুর কাদা।

সামি উৎসাহী কণ্ঠে বললো-হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের নদীগুলোতে প্রচুর পলি জমে।

ক্যাথি হাত নাড়িয়ে তার শরীরের ডান পাশ ইঙ্গিত করে বললো-এখানে আমি একটা বিশাল দালান দেখতে পাচ্ছি। কারখানা হতে পারে, কিংবা ঐ জাতীয় কিছু!

আভা প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে দীপুর দিকে ফিরলো। দীপু বললো-ওখানে একটা সিমেন্টের কারখানা আছে খুব সম্ভবত।

লম্বা লোকটি তার কথা লুফে নিয়ে বললো-হ্যাঁ ক্যাথি। সেখানে একটি সিমেন্টের কারখানা আছে। তুমি কি এ্যানিসকে দেখতে পাচ্ছো? এ্যানিস কোথায়?

ক্যাথি কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে বিষাদ ক্ষীণকণ্ঠে বললো,-হ্যাঁ, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। নদীর তলায়, কাদার নীচে চাপা পড়ে আছে তার শরীরটা। তার পা জড়িয়ে আছে একটা লতানো গাছে। কি নাম জানি না। কিন্তু সেই লতার ফাঁকে তার ডান পা ভয়ানক ভাবে জড়িয়ে গেছে। তার মুখটা কাদার নীচে। খুব সম্ভবত নদীতে লাফিয়ে পড়েছিলো সে, লতায় তার পা আটকে যায়, অনেক চেষ্টা করেও পানির উপরে উঠে আসতে পারেনি সে। তার শরীরের উপর কাঁদার স্তর পড়ে গেছে। ফলে কেউ খুঁজে পায়নি তার মৃতদেহ।

আভা নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করলো। বিশৃঙ্খল পায়ে দোকানের ভেতরে পায়চারী করছে সে। ক্যাথি চোখ খুলেছে। সে বললো-আমি সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু এখন আর আমাদের কিছুই করার নেই।

আভা কান্না জড়ানো গলায় বললো-কিন্তু নদীর ঐ দিকটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। লাশ যদি তীরের কাছে থাকতো তাহলে নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যেতো। ক্যাথিকে অসহায় মনে হলো। তার সঙ্গীদের দিকে তাকালো সে। লম্বা লোকটি সংযত কণ্ঠে বললো-পুরু হয়ে জমে থাকা কাদার মধ্যে মৃতদেহ আটকে গেছে। উপর থেকে দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। একমাত্র কাদা সরালেই দেহটি দেখা যাবে। আমি সত্যিই দুঃখিত।

আভা দোকানের পেছন দিকে চলে গেলো। কান্না থামাতে পারছে না সে। দীপু ইতস্ততঃ করে নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকলো। সহানুভূতি জানানোর ব্যাপারে সে বিশেষ পটু নয়। সে আশা করছিলো পিংকি এই ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। কিন্তু পিংকিকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত মনে হলো। সে সম্ভবত ক্যাথির কথাবার্তা কানেও নেয়নি। গভীর মনোযোগ দিয়ে পাথর বাছছে সে। একটি নীল এবং একটা লাল পাথরের মধ্যে ঠোকাঠোকি লেগে গেছে। কোনটা নেবে ঠিক করতে পারছে না। বোনের অসম্ভব ভক্ত দীপু। সে বহু কষ্টে হাসি ঠেকালো। সামি অবশ্য একটু বিরক্তই হলো। সে চাঁপা গলায় বললো-ওকে একটু সান্তনা দাও না।

পিংকি বিশেষ আগ্রহ না দেখালেও আভার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ক্যাথি দীপুকে লক্ষ্য করে বললো- তোমার মেয়ে বন্ধু খুব ভেঙে পড়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক।

দীপু লাল হয়ে উঠলো। কান্ডটা দেখেছো এদের। এখানে বসে বাংলাদেশের নদীর তলায় লাশ দেখতে পাচ্ছে, অথচ এই মেয়ে যে তার মেয়ে বন্ধু নয় এই সাধারণ ব্যাপারটা চোখে পড়ছে না? সে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললো-কিভাবে সে মারা গেছে সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে তুমি? আনিস খুবই ভালো সাতারু ছিলো। পানিতে ডুবে মারা যাওয়াটা তার জন্য স্বাভাবিক নয়। ক্যাথি চিন্তিত কণ্ঠে বললো-তোমাদের ধারণা তার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়?

দীপু শ্রাগ করলো। - কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু অনেকেই তার বন্ধুকে সন্দেহ করে। আনিসের বাবা এবং এই বন্ধুর বাবার মধ্যে ব্যবসায়িক কোন্দল আছে। আমাদের দেশে এর চেয়ে সামান্য কারণেও মানুষ মারা যায়।

ক্যাথি বললো-এই দেশেও যায়। সবখানেই মানুষের এক রূপ। লোভ ও হিংসা। দাঁড়াও, এই ছবি দুটোকে আমি আরেকটু ভালো করে দেখি। এই বন্ধুটির নাম কি?

-সুজন।

-সুজন? খুবই কঠিন মনের ছেলে। তার দৃষ্টিতে মমতা কম। হৃদয়টা নিষ্ঠুর। এই ছেলেকে দিয়ে অনেক কিছুই সম্ভব। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেই এ্যানিসকে হত্যা করেছে। এ্যানিসের মৃত্যু আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

আভা ফিরে এসেছে। তার দু'চোখ লাল হয়ে আছে। সে ভেজা গলায় বললো-তুমি বলছো সুজনের এতে কোন হাত নেই? ওর তাহলে এই ঘটনায় ভূমিকাটা কি ছিলো? ও কেন অনেক কথা চেপে যাচ্ছে?

খাটো লোকটি বললো- চেপে যাচ্ছে এটা তোমরা কিভাবে বুঝলে?

-সে পুলিশের অধিকাংশ প্রশ্নেরই উত্তর ভালোভাবে দেয়নি। আমাদের ধারণা ঐ ঘটনার সময় সে ছাড়া আরো কয়েকজন ছিলো। কিন্তু সূজন বলছে শুধুমাত্র তারা দুজন ছিলো। বাকীরা আগেই বাসায় ফিরে যায়।

ক্যাথি সুজনের ছবিটা আবার হাতে তুলে নিলো। আনিসের ছবিটি সুজনের ছবির পাশাপাশি রেখে মনোযোগ দিয়ে দেখছে সে। লম্বা লোকটি ছবি দুটির উপরে চোখ রেখে বললো-নাহ্ আমি এখানে কোন ষড়যন্ত্র দেখছি না। ক্যাথি মাথা দোলালো। -হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো। তারা দুজনই ছিলো সহযাত্রী। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। পাঁচজন ব্যাংক ডাকাতি করতে গেছে। ডাকাতি করে বের হবার সময় পুলিশের সামনাসামনি পড়ে গেলো তারা। তিনজন পালালো। বাকী দু'জনের একজন মারা গেলো, অন্যজন ধরা পড়লো। আমার কথা বুঝতে পারছো?

সামি উত্তেজিত হয়ে বললো-তুমি বলছো ওরা পাঁচজন ছিলো?

-হ্যাঁ! পাঁচজন। সামনের সিটে দু'জন। পেছনের সিটে তিনজন। নদীর পাড়ে যায় তারা। নদীর অন্যপাশে শহর। কিছু একটা ঘটে সেই শহরে। তার জের হিসাবে ঘটে এই ঘটনা।

দীপু বললো-হ্যাঁ, এই নদী ঢাকা শহরের পাশ ঘেঁষে গেছে।

আভা সন্দিহান কণ্ঠে বললো-কিন্তু কি ঘটনা ঘটেছিলো? আমার ভাই ছিলো সাদা সিধা মানুষ। কোন গোলমালে জড়াতো না।

লম্বা লোকটি বললো-ড্রাগস্ জাতীয় কিছু একটা হবার সম্ভাবনা আছে।

তার কথা লুফে নিলো ক্যাথি-হ্যাঁ, ড্রাগস কিংবা টাকা পয়সা নিয়ে ঝামেলা হয়। তোমার ভাই ছিলো খুবই সাহসী মানুষ। সে এবং সুজন ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। এ্যানিস একটি নৌকায় ওঠার চেষ্টা করে। সে পড়ে যায়। তার পা আটকিয়ে যায় লতায়। সে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু আফসোস, তার চেষ্টা বৃথা যায়। সুজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আভা কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকে। সম্ভবত ক্যাথির কথা সে বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে পারছে না। ক্যাথি বললো- তোমরা চারজন আমার সামনে গোল হয়ে দাঁড়াও। তোমাদের সবার ইচ্ছে শক্তি আমার দরকার। দেখি আমি আরো কিছু জানতে পারি কিনা।

কাউন্টারের সামনে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করলো ওরা চারজন। ক্যাথি চোখ বুঁজে ধ্যান করবার ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকলো। খাটো লোকটি বললো- নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছো? ক্যাথি চোখ খুলে বললো- একটা শব্দ আমার মাথায় ধ্বনিত হচ্ছে। র‍্যান্ড। তোমাদের কাছে এই শব্দটা কি পরিচিত মনে হয়?

লম্বা লোকটি গভীর আগ্রহ নিয়ে বললো- এটি নিশ্চয় তোমাদের ভাষার কোন শব্দ। চিন্তা করে বলো।

সামি তৎপর ভঙ্গীতে বললো-র‍্যানডাম?

-না না, এটি ইংরেজী শব্দ। আরেকটু চিন্তা করে বলো।

-রাম দা!

-কি সেটা?

-এটা একধরণের তীক্ষ্ণধার অস্ত্র।

-অস্ত্র? এ ছাড়া অন্য কিছু হয় না?

খাটো লোকটি বললো - এটা একজনের নামও হতে পারে। এই নামে কাউকে চেনো তোমরা?

আভা চিন্তিত স্বরে বললো- রঞ্জু নামে ভাইয়ের একজন বন্ধু ছিলো।

লোক দু'জনাই মুখ উজ্জ্বল করে বললো- তাহলে এটি নিশ্চয় রন্‌জু। সে কি ঐ জন্মদিনের পার্টিতে ছিলো?

ক্যাথি উত্তর দিলো- হ্যাঁ, নিশ্চয় ছিলো। কিন্তু সে খারাপ কোন কিছুর সাথে জড়িত নয়। আচ্ছা বোম্বে শব্দটি কি তোমাদের কাছে পরিচিত মনে হয়? এই শব্দটাও আমার মাথায় ঘুরছে?

দীপু বললো - বোম্বে ইন্ডিয়ার একটা শহর।

-না না, শহর নয়। অন্য কিছু?

- বম্ব? আমরা বাংলা বলি বোমা।

- বম্ব! হ্যাঁ, তাহলে তাই-ই হবে। কিন্তু এই ঘটনার সাথে তার সম্পর্ক সরাসরি নয়। এ্যানিসের চরিত্র ছিলো অনেকটা বম্বের মতো। খুব মেজাজী, কঠিন মন। হঠাৎ বম্বের মতো ফেটে পড়তো। কোমরে পিস্তল গুজে রাখার মতো মানুষ।

আভা তিক্ত কণ্ঠে বললো- না, মোটেই না। ও ছিলো মাটির মানুষ। পিস্তল কখনো হাতে ছুঁয়েও দেখেনি।

ক্যাথি অপ্রতিভ হয়ে পড়লো।- আমি জানি তুমি খুবই কষ্ট পাচ্ছো। ভাই খুবই কাছের মানুষ। তোমার কষ্ট আমিও অনুভব করতে পারছি। সত্যি কথা বলতে কি তুমি যে এখানে এসেছো সেটা এই কষ্টের জন্যেই। তোমার ভাইয়ের বিদেহী আত্মা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তুমি চাও তাকে শান্ত করতে। আমিও তাই চাই। যে চলে গেছে তাকে ফেরত পাওয়া যাবে না, কিন্তু সে যেন চিরদিনের জন্য শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকে সেই ব্যবস্থা করা যায়। তুমি বরং আরেকদিন এসো। তোমার ভাইয়ের হাতের ছোঁয়া আছে এমন কিছু একটা নিয়ে এসো সাথে করে। আমরা সবাই একসাথে বসে সেই বিদেহী আত্মাকে শান্তি দেবার চেষ্টা করবো।

ক্যাথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো আভা। পিংকি অনেক চিন্তা ভাবনার পর লাল, নীল দু'টি পাথরই কিনে ফেললো। ক্যাথি এই সেশনের জন্য কিছুই চার্জ করলো না। সে মমতা মাখানো কণ্ঠে বললো- আমি মানুষকে সাহায্য করবার চেষ্টা করি। টাকাপয়সা বড় কথা নয়।

রাস্তায় পা রেখেই পিংকি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো - যাক বাবা, টাকাটা অন্তত বাঁচলো। গল্পবাজির জায়গা পায় না। আভা, এই সব হাবিজাবি কথা একদম বিশ্বাস করো না। উইচ্ না ঘোড়ার ডিম!

আভা বললো- ওর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি নি। আমি শীলা ম্যাকনিলের সাথেই দেখা করবো। এই ক্যাথি কিচ্ছু জানে না।

দীপু প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করলো- ক্ষিধে লেগেছে কারো?

আভা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠলো- এতো খাই খাই করেন কেন সব সময়? মানুষের জীবনের কোন দাম নেই আপনার কাছে?

দীপু একেবারেই চুপসে গেলো। খাওয়ার কথাটা না তুললেই হতো। কিন্তু পরিবেশ বুঝে কথা বলায় সে বিশেষ রকম অপটু। প্রায়শই অবান্তর আলাপ তুলে ফেলে। সে মুখ বন্ধ করে রাখার সিদ্ধান্ত নিলো।

১২

গাঢ় করে সন্ধ্যা নেমেছে। তুষার পড়ছে সমানে। ঠান্ডা বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ফিরতি পথ ধরলো ওরা। স্বভাবমতো পথ হারালো দীপু। দু'জায়গায় থেমে পথ জিজ্ঞেস করতে হলো। পীচ কালো অন্ধকারে হেডলাইটের সামান্য আলোয় দৃষ্টি ভালো চলে না। দীপু গভীর মনোযোগ দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছে। গাড়ীর ভেতরে সরব আলাপ চলছে। ক্যাথিকে তুলোধুনো করছে আভা।- বেটি খুব উইচগিরি ফলালো! নিজের থেকে একটা কথাও ঠিক মতো বলতে পারলো না। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে! তুই যদি সব জানবি তাহলে অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন?

পিংকির কণ্ঠ সবার কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠছে- পুরো ভাওতাবাজি। প্রথমে বললো এক কথা, শেষে গিয়ে বললো আরেক কথা! দেড় বছর হয়ে গেছে এখনো কোন হদিস পাওয়া যায় নি, সুতরাং ওরা ধরেই নিয়েছে এই ছেলে নির্ঘাত মারা গেছে। ধড়িবাজের ধড়িবাজ।

দীপু বললো-কয়েকটা কথা কিন্তু সে ঠিক বলেছে। ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিলো সেখানে সত্যি সত্যিই একটা সিমেন্টের কারখানা আছে। নৌকার কথাটাও ভুল বলেনি। ঐ ঘটনা যখন ঘটে তখন ওখানে একটা বার্জ নোঙর করা ছিলো। সুজন বলেছিলো এটা। গাড়ীতে পাঁচজন ছিলো এটাও ঠিক। সুজন স্বীকার না করলেও এই তথ্য সবাই জানে।

সামি বললো- যে কোন নদীর তীরেই কারখানা কিংবা গুদাম জাতীয় দালান থাকেই, বিশেষ করে শহরের নিকটবর্তী নদীগুলোতে। সুতরাং এটা আন্দাজের উপর বলা যায়। নৌকার ব্যাপারটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়াও হতে পারে।

দীপু বললো- হতে পারে। গাড়ীতে পাঁচজন ছিলো সেটাও অবশ্য বুড়ী সরাসরি বলেনি। ওটা উদাহরণের জের ধরে চলে এসেছিলো।

পিংকি তিক্ত গলায় বললো-সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। কলাকচু জানে এরা। পাশের লোকদুটো আবার কোথেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো। বুড়ী একটা কথা বললেই তারা আবার ঘোরপ্যাঁচ দিয়ে তার একটা মানে বের করে ফেলে। র‍্যান্ড বলে বাংলা ভাষায় কোন শব্দ আছে? গাধা পেয়েছে আমাদেরকে? র‍্যানড আর রঞ্জু এক হলো?

সামি আচমকা বললো- ওটা রয়-ও হতে পারে! অনেক ইন্ডিয়ানের পদবি রয়। বুড়ী সেটা নিশ্চয় জানে।

আভা সোৎসাহে বললো- ঠিক বলেছেন। বোম্বের নামটাও হয়তো কোথাও শুনেছে। দেখেছে আমরা ঐ এলাকার মানুষ, ব্যস ঝেড়ে দিলো। থাপড়িয়ে দাঁত খুলে ফেলতে হয়। না জেনে শুনে একটা মানুষকে কাদার নীচে পুতে ফেললো! ছি! ছি!

পিংকি বললো- তবু ভালোর ভালো। পয়সাকড়ি কিছু নেয়নি। একটা টাকা দিতে হলেও রাতে আমার ঘুম হতো না।

আভা দৃঢ় গলায় বললো-শীলা ম্যাকনীল হচ্ছে আসল লোক। সে ঠিকঠাক বলতে পারবে। কি বলেন দীপু ভাই?

দীপু বিপদে পড়ে গেলো। এই সব উইচ্ কিংবা সাইকিকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই তার। কৌতুহল অবশ্য আছে। শীলা ম্যাকনীল কি বলে সেটা জানার যথেষ্ট আগ্রহ আছে তার। কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক কি ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখানোটা যথাযথ হবে সেটা নিয়ে সে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলো। বোঝাই যাচ্ছে আভা মন্দ কিছু শুনতে আগ্রহী নয়। তার ভাইয়ের অন্তর্ধান হবার রহস্যের সমাধান হোক এটা আভা চায়, কিন্তু আশাব্যঞ্জক কিছু একটা শুনতেও সে আগ্রহী। ক্যাথি ম্যাকনামারার কথাবার্তা সবই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। হয়তো শীলা ম্যাকনীল ভালো কিছু বলবে। সে বললো- আলাপ করায় দোষের কিছু দেখছিনা। এদের কথায় বিশ্বাস করতেই হবে এমন তো কোন কথা নেই। কিন্তু কি বলে জানতে দোষ কি?

আভা দাঁত কিড়মিড় করলো। -সব কথায় এতো পেঁচিয়ে জবাব দেন কেন? সরাসরি হ্যাঁ, না, বলতে পারেন না?

দীপু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। তার উপরে রাগ দেখিয়ে কি লাভ?

আভা কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো-ক্ষিধে লেগেছে। সামনে কোন ফাস্ট ফুড রেষ্টুরেন্ট দেখলে থামাবেন।

হাইওয়ের পাশে একটি ম্যাকডোনাল্ডস দেখে গাড়ী থামালো দীপু। মহারানীকে পিংকিদের সাথে কানেকটিকাট পাঠিয়ে দিতে পারলে এই যাত্রা বেঁচে যায় সে।

মার্লবোরো পৌঁছতে সন্ধ্যে সাতটা বাজলো। পিংকি এবং সামি অপেক্ষা করতে রাজী নয়। আবহাওয়ার অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়। রাস্তার অবস্থা আরো শোচনীয় হবার আগেই বাসায় পৌঁছতে আগ্রহী তারা। দীপুর বাসায় এলে সাথে করে লেপ, তোষক, বালিশ নিয়ে আসে ওরা। সামি ঝট্‌পট বাক্স-পেটরা গুছিয়ে ফেললো।

আভা গম্ভীর মুখে বললো-সামি ভাই, আজকের রাতটা থেকে গেলে হয় না। পিংকি তৎক্ষনাৎ জবাব দিলো-না। কাল সকালে ওর কাজ আছে। আমরা গরীব মানুষ। একদিনের কাজ মাটি হলে সমস্যায় পড়ে যাবো।

আভা কিছুক্ষণ ইতস্তত পায়চারী করে দীপুর কাছে তার গাড়ীর চাবি চাইলো।

-আপনার গাড়ীতে আমার রুমালটা ফেলে এসেছি।

দীপুর সন্দেহ করবার কোন কারণ ছিলো না। সে চাবি হাত বদল করলো। আভা গাড়ী নিয়ে উধাও হয়ে গেলো। কাঁচের স্লাইডিং ডোর দিয়ে তিন জোড়া চোখ সেই দৃশ্য হতবাক হয়ে অবলোকন করলো।

পিংকি বিহ্বল কণ্ঠে বললো-এই মেয়ের কি মাথা খারাপ? ভাইয়া, ওর হাতে তুমি গাড়ীর চাবি দিলে কেন?

দীপু অসহায় কণ্ঠে বললো-রুমাল ফেলে এসেছে বললো। আশে পাশে কোথাও গেছে হয়তো। এখনিই ফিরে আসবে।

-হ্যাঁ, ফিরবে না ছাই। তোমার সাথে এক বাসায় রাত না কাটালে ওর চলছে না। সর্বনাশ করবার তাল। এমন বদমায়েশ মেয়ে জীবনে দেখিনি।

সামি হতাশ গলায় বললো-আমরা কি অপেক্ষা করবো?

রাত ৯টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো তারা। আভা ফিরলো না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলো পিংকি। দীপুকে বিশেষভাবে সাবধান করে বিদায় নিলো সে।

সামিরা এপার্টমেন্ট কমপেক্সের গন্ডী পার হবার মিনিট খানেকের মধ্যেই দীপুর শ্বেতধবল গাড়ীটা তার বদন দেখালো। আভা ভেতরে ঢুকেই বললো-পিংকি আপা খুব ক্ষেপেছে, ঠিক না?

দীপু বিরক্ত হবে না আতংকিত হবে ঠাহ্‌র করতে পারছে না। সে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য নিয়ে বললো-কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

-কোথায় যাবো আবার? পেছনের পার্কিং লটে বসেছিলাম। এই দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে পেছনের গেট দিয়ে ঢুকেছি। দুই ঘন্টা অকারণে বসে থাকলাম, ভাবা যায়? আমার পায়ে ঝিম্‌ ধরে গেছে।

-এই ফাজলামীর অর্থ কি?

-এটা ফাজলামী নয়। আপনার সাথে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আছে। আপনাকে একা পাওয়াটা জরুরী ছিলো।

-তুমি আমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

-আপনি পুরুষ মানুষ, আপনার এতো ভয় কিসের?

-তোমাকে ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ আছে।

-কেন? আপনার ধারণা একা পেয়ে আপনাকে ধর্ষণ করবো।

-একদম বাজে কথা বলবে না।

-আপনার সাথে কথা বলতেই আমার ইচ্ছা হয় না।

-কথা বলতে সাধছে কে?

-সব সময় এতো মেজাজ দেখান কেন?

-মেজাজ আমি দেখাই না তুমি দেখাও।

-ফালতু কথা বলবেন না। আজ রাতে আপনি লিভিংরুমে শোবেন। আমি আপনার ঘর দখল করছি। দরজা কি ভেতর থেকে লক্ করা যায়?

-না। আমার জন্য সুখবর।

-সাহস থাকলে রাতে ঢুকবেন ঐ ঘরে। পা ভেঙে হাতে ধরিয়ে দেবো।

-এই সব কি ধরণের কথাবার্তা?

আভা সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলো না। সে তার কামরার দখল নিতে চলে গেলো। দীপু বাস্তবিকই আতংক অনুভব করতে শুরু করেছে। এই ঝামেলা আগামী পাঁচদিনে কোন পর্যায়ে পৌঁছবে কে জানে?

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আভার শ্রীবদন দেখা গেলো আবার।

-দীপু ভাই, আমার বাক্সগুলো নিয়ে আসেন তো।

-মাথা খারাপ। ঐ দুই টনি বাক্স টানবার কোন ইচ্ছা নেই আমার।

-প্লিজ।

-সম্ভব না।

আভা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো-ঠিক আছে, তাহলে চাবি দেন। মেয়ে বলে দূর্বল ভাববেন না। সেক্সিষ্ট (Sexist).

দীপু চাবি দিয়ে বললো-ট্রাঙ্কের ঢাকনী আটকাতে ভুলো না।

-লজ্জা করলো না বলতে?

আভা দরজায় প্রচন্ড শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলো। দীপুকেও তার পিছু নিতে হলো। এই মেয়েকে একা ছাড়তে তার খুবই ভয় হয়। রাগের মাথায় গাড়ীতে একটা লাথি বসালেই কয়েক শ' ডলার গচ্চা। স্বভাব মতো কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকলো আভা। দীপুকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাক্স দু'টিকে এপার্টমেন্টে ঢোকাতে হলো। বাক্স খুলতে ডজন ডজন জামাকাপড় বেরিয়ে এলো। আভা বললো- কোনটা পরবো বলেন?

-তোমার যা ইচ্ছা পরো। আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন?

আভা মুচকি হেসে বললো-আমি জানি আপনার নীল পছন্দ।

-আমার পছন্দ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও জানা ছিল না।

-মাথা ঘামাই কে বললো? আপনি সব সময় যেমন হা করে তাকিয়ে থাকেন তাতে বরং বিরক্তিই লাগে।

দীপু হতভম্ব হয়ে গেলো।- তোমার ধারণা আমি সবসময় তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি?

-থাকেনই তো। একটু আগে আপনি আমার বুকের দিকে তাকান নি?

দীপু অসম্ভব গাম্ভীর্য নিয়ে বললো-ইচ্ছে করে তাকাইনি।

আভা খিল্ খিল্ করে হাসছে।-খুব চুরি করে এদিকে সেদিক তাকানো হয়।

-বাজে কথা বলো না। রাত হয়েছে। শুয়ে পড়।

-রাত দুইটার আগে আমি বিছানায় যাই না।

-তোমার যা ইচ্ছা করো। আমাকে ঘুমাতে হবে। কাল সকালে অফিস আছে।

-আপনি ঘুমিয়ে পড়লে আমি একাকী কি করবো?

-সেটা আমার মাথাব্যথা নয়।

- আপনাকে ঘুমাতে দিলে তো।

আভা কামরায় ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিলো। দীপু লিভিংরুমের মেঝেতে শয্যা পাতলো। সে সাধারণত এতো তাড়াতাড়ি বিছানায় যায় না। কিন্তু সেটাই তার কাছে আপাতত সবচেয়ে নিরাপদ মনে হচ্ছে। আভার সাথে বক্ বক্ করবার অর্থই হচ্ছে শেষতক ঝগড়া শুরু করা। এই গভীর রাতে ঝগড়া করবার কোন আগ্রহ সে অনুভব করছে না। দীপু আলো নিভিয়ে দিলো।

দীপুর সবেমাত্র চোখ জোড়া লেগে আসছিলো, কাঁধে খোঁচা খেয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলো সে।

আভা কাঁচুমাচু কণ্ঠে বললো-কিছু মনে করবেন না দীপু ভাই। আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝতে পারিনি।

দীপু বললো-আলোটা জ্বালো।

-আপনি শুয়ে থাকেন। আমি আপনার পাশে একটু বসি।

দীপু শুলো না। সে একটু সরে বসলো।-ঘুম আসছেনা?

আভা যথেষ্ট দূরত্ব রেখে বসলো। -এমন ভড়কে গেছেন কেন আপনি?

আপনার কি ধারণা আমি আপনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো?

-ঝগড়া করবার জন্য ঘুম ভাঙালে?

আভা হালকা কণ্ঠে হাসলো।-না। দেখা হলেইতো আমরা শুধু ঝগড়া করি। সত্যি কথা কি জানেন? আপনার সাথে ঝগড়া করতে আমার খুব ভালো লাগে। আপনার ভালো লাগে না?

-ঝগড়াঝাঁটি আমার পছন্দ না।

-হয়েছে, অতো ভাব দেখাতে হবে না। আমি একটু গল্প করতে এসেছি। আমরা দু'জন শেষ কবে সুস্থ মানুষের মতো কথা বলেছি মনেও পড়ে না।

দীপু চুপ করে থাকলো। রাস্তায় একটি ল্যাম্প পোষ্টে নিঃসঙ্গ জ্বলছে অনুজ্জ্বল বাল্ব। কাঁচের স্লাইডিং ডোর ভেদ করে হালকা আলোর রশ্মি ভেতরে এসে ঢুকেছে। খুব কাছেই বসে থাকা আভার অবয়বটিকে সেই ক্ষীণ আলোয় অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। মেয়েটির শরীরের গন্ধ তার নাকে এসে ঝাপটা দিচ্ছে। বুকের ভেতরে ধড়ফড়ানী শুরু হয়েছে। দীপু আভার উপর অসম্ভব বিরক্ত হচ্ছে। এই মেয়েটি অত্যন্ত ভালো ভাবেই জানে দীপু তার প্রতি বিশেষ রকম দূর্বল। তারপরও এই জাতীয় কাজ করবার যৌক্তিকতা কোথায়? সে মাথা নীচু করে বসে থাকলো।

আভা বললো-কথা বলছেন না কেন?

-তুমি বলো আমি শুনছি।

-আমাকে এতো লজ্জা কেন আপনার? সেই ছোটবেলা থেকে একরকম পাশাপাশি বড় হয়েছি। আপনার নানার বাড়ীর উঠোনে চাঁদনী রাতে দল বেঁধে বুড়ীছোঁয়া খেলার কথা মনে আছে আপনার? কলাগাছের ভেলা বানিয়ে পুকুরে মাছ ধরতাম আমরা! আপনি সাঁতার জানতেন না। সুযোগ পেলেই আমি আপনাকে ঠেলে

পানিতে ফেলে দিতাম। আপনি গলা সমান পানিতে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুড়তে ছুড়তে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে চীৎকার করতেন।

আভা হাসতে লাগলো। দীপু সেই হাসিতে যোগ দিলো। ছোটবেলার সেই দিনগুলো কখনো ভুলবার নয়। দল বেঁধে খই গাছ থেকে খই পেড়ে খাওয়া, আমের ভর্তা নিয়ে কাড়াকাড়ি, ঢিল মেরে গাব পাড়া, বাল্যকালের চেয়ে মধুর আর কিছু নেই।

আভা নীচু গলায় বললো- সেসব কথা মনে আছে আপনার?

-ওসব কি ভোলা যায়?

-আপনি আর ভাইয়া ছিলেন ছায়াসঙ্গী। সব সময় সাথে সাথে থাকতেন। সবাই বলতো, ওদের এক মায়ের পেটে জন্মানো উচিৎ ছিলো। আপনারা দু'জন একসাথে গ্রামের বাড়ীতে গেলে সবাই হুশিয়ার হয়ে যেতো। কারো ঘরের চালে ঢিল পড়লেই চীৎকার শোনা যেতো-দীপু! আনিস! শহরে তোদের জায়গা হলো না? আবার গাঁয়ে এসেছিস!

আভা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। দীপু দৃষ্টি ফেরাতে পারলো না। আভা হাসি থামিয়ে বললো-ভাইয়ার সাথে আপনার একবার ভীষণ মারামারি হয়েছিলো, মনে আছে?

দীপুর মনে না থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই লজ্জাঙ্কর কাহিনী তুলবার ইচ্ছা তার নেই। সে চুপ করে থাকলো। আভা ঠোঁট টিপে হাসছে। দীপু অন্ধকারেও যেন মেয়েটির গালের হালকা টোল জোড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আভা বললো-কি হলো, একেবারে চুপ করে গেলেন যে? নারকেল বাগানে আমাকে চুমু খাবার চেষ্টা করেছিলেন আপনি। বারো বছর বয়েসেই এমন বাঁদর ছিলেন! আমি ভাইয়াকে বলে দিলাম। পাক্কা তিন ঘন্টা খামচাখামচি করেছিলেন দু'জন।

আভা আবার হাসছে। দীপুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ঐ বয়সে সে এমন লম্পট ছিলো ভাবাই যায় না। আভা নিঃশব্দে নিজের চুলে কিছুক্ষণ আনমনে বিলি কাটলো।-ভাইয়া মারা গেছে ভাবতেও পারি না আমি।

দীপু বললো-কখনো ভাবিনি ওর সাথে আমার আর কখনো দেখা হবে না। যখন আমেরিকা আসি, আমার সাথে দেখাও করে নি ও। ওর এখানে আসবার এতো ইচ্ছা ছিলো, চাচা আসতে দিলেন না। ব্যবসা দেখতে হবে ওকে। আমি তোমাদের বাসায় গেলাম ওর সাথে দেখা করতে, আমাকে দেখেই গাড়ী নিয়ে ভো করে বেরিয়ে গেলো।

আভা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো-আপনাকে বিয়ে করতে চাইনি বলে ভাইয়া আমি চলে আসবার সময়েও আমার সাথে একটাও কথা বলেনি। এতো অসম্ভব অভিমান ছিলো ওর।

আভার চোখ ভিজে উঠেছে। সে হাতের পিঠে চোখ মুছলো- দেশে ফিরতে আমার খুব ভয় হয়। এখানে বসে ভাইয়া না থাকার দুঃখটা ততটা বুঝতে পারি না। কিন্তু দেশে ফিরলেই অভাব বোধটা এমনভাবে গ্রাস করে, মনে হয় পালাতে পারলে বাঁচি। সবার উপরে অসম্ভব রাগ হয়। ইচ্ছে হয় একটা পিস্তল কিনে ওর বন্ধুগুলোকে গুলি করে মারি। মিথ্যুকের দল। ওদের সাথে বেরিয়ে গেলো ভাইয়া, আর ওরা কিছু করতে পারলো না, এটা কি করে সম্ভব? একটা সুস্থ মানুষ এতগুলো মানুষের চোখের সামনে কি করে পানিতে ডুবে মারা যায়?

ডুকরে কেঁদে উঠলো আভা। দুই হাঁটুতে মুখ গুজে কান্নার দমক রুখবার চেষ্টা করছে সে। দীপু আলতো করে তার বাহুতে হাত রাখলো। আভা দীর্ঘক্ষণ কাঁদলো। দীপু নিঃশব্দ দর্শক হয়ে থাকলো। রাত গভীরতর হচ্ছে। দীপু তাকে বিছানায় পাঠিয়ে দিলো। তার নিজের ঘুম ছুটে গেছে। সে বাকী রাত ছটফট করে কাটালো।

১৩

সকালের দিকে চোখজোড়া একটু লেগে এসেছিলো দীপুর, গাড়ীর হর্ণের প্যাঁ প্যাঁ শব্দে ধড়ফড়িয়ে ওঠে বসল ও। কোন পোলাপানের কাজ। ঘড়ি দেখলো। নয়টা দশ। বেডরুমে উঁকি দিয়ে দেখলো আভা গভীর ঘুমে মগ্ন। আনন্দের বিষয়। মেয়েটি জেগে থাকলেই সমস্যা। দীপুর একটু অফিসে যাওয়া দরকার। জরুরী কিছু কাজ পড়ে আছে, শেষ না করলেই নয়। আভার ঘুম ভাঙালো না সে। একটি চিরকুটে তার অফিসের ফোন নাম্বার লিখে ডাইনিং টেবিলে গাস চাপা দিয়ে এপার্টমেন্ট ছাড়লো। এই মেয়েকে বাসায় একা রেখে যাওয়াটাও দুঃশ্চিন্তার ব্যাপার।

আবহাওয়ার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। আকাশ মেঘলা। তুষার পড়ছে না কিন্তু লক্ষণ খুব সুবিধার মনে হচ্ছে না। আজকাল তুষার গায়ে মাখে না দীপু, তারপরও একটুখানি রোদের ঝলকানি দেখতে পেলে ভালো লাগতো। এই বিষাদময় পরিবেশ ওকেও অল্প বিষন্ন করে তোলে। গাড়ী চলছে পালতোলা নৌকার মত। কোথাও আপন গতিতে গড়িয়ে চলছে, কোথাও আবার কসরৎ করতে হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ীগুলি তুষার পরিষ্কার করে চলছে সমানে। কিন্তু তারপরও

বিশেষ লাভ হচ্ছে না। এই টনকে টন বরফ এবং তুষারের আস্তর পরিষ্কার করা সহজ কাজ নয়।

অফিসে পৌছে অবাক হলো দীপু। পার্কিং লটে কম করে হলেও ডজন খানেক গাড়ী। একে তো রোববার, তায় এই আবহাওয়া! অফিসের ভেতরে ঢুকে দেখলো ওর গ্রুপের প্রায় সবাই হাজির। রোজমেরী ওকে দেখেই ছুটে এলো। -বোনের সমস্যা মিটলো তাহলে!

-সেই কপাল আমার নেই রোজমেরী। বাসায় এসে উঠেছে।

রোজমেরী ঠোঁট টিপে হাসে। -তাতো বটেই!

-না না, তুমি যা ভাবছো তা নয়।

-তুমি যা বলো!

দীপু শ্রাগ করলো। এই মহিলার সাথে কথায় পারা সম্ভব নয়। সে বললো-আমার বাকী কাজটুকু আজকের মধ্যেই শেষ করে দেবো। কিছু ভেবো না।

রোজমেরী কণ্ঠ চিকণ করে বললো- না, ভাবনা আমার হবে কেন? গত তিন দিন ধরে ঐ কথা শুনছি।

দীপু কথা বাড়ায় না। মহিলাকে ক্ষ্যাপানো সুবিধাজনক নয়। একটু খুঁচিয়ে আনন্দ পেলে ভালো। হাতের কাজ সময় মতো শেষ না করলে সমস্যা আছে। মুখোমুখি কিউবে বসে লেবানীজ ইব্রাহিম। লম্বা, চওড়া শরীর, সর্বক্ষণ মহানন্দে আছে। একটি বন্ড বান্ধবী বাগানো অবধি তার মুখের হাসি থামতে দেখেনি দীপু। আরবদের প্রতি তার ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ নেই। বিশেষ করে এই ব্যাটাকে দেখলেই তার শরীর রি রি করে ওঠে। জীবনের প্রতিটি কণা আনন্দে ভরপুর করে তুলবার এমন নগ্ন প্রচেষ্টা দীপুর পছন্দ নয়। সর্বক্ষণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলাপ চলছে, তার বান্ধবী নিয়ে অর্বাচীনের মতো দম্ভপূর্ণ কথাবার্তা বলছে, অকারণে সহকর্মীদের খুঁচিয়ে বেড়াচ্ছে - তার মধ্যে কোন গভীরতার লেশমাত্র নেই। পরিচয়ের কয়েক মূহুর্তের মধ্যেই দীপু বুঝেছিলো, এই সহকর্মীটি তার অসম্ভব বিরক্তির কারণ হবে। ইব্রাহিম আজ অবধি তাকে ভুল প্রমাণিত করে নি।

দীপুকে দেখেই সে হেড়ে গলায় বললো - এই খবর কি তোমার?

দীপু নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো -ভালো।

-গতকাল কেমন তুষার পড়লো! উম্, এমন রাতে বিছানায় ..... একজন বন্ড ..... ভাবতে পারো!

দীপু দাঁত কিড়মিড় করলো। -তোমার চিন্তাগুলো বিছানাতে রেখে আসা উচিৎ।

-তুমি সবসময় এতো গম্ভীর থাক কেন? তোমারও উচিৎ দু'একটা মেয়ে বন্ধু বাগানো।

এই কথার একটু বাঁকানো অর্থ আছে। ইব্রাহিমের ধারণা মেয়ে বন্ধু বাগানোয় সে বিশেষ রকম পটু। দীপুর অনীহাকে সে অক্ষমতা বলে ভ্রম করে। দীপুর মেজাজ চড়ে গেলো। সে কণ্ঠস্বর উঁচিয়ে বললো - দশ ঘাটের পানি খাওয়া মেয়েদের পেছনে আমি ঘুরি না। তেমন সামাজিক পরিবেশ থেকে আমি আসি নি। ভবিষ্যতে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মন্তব্য করবার আগে দু'বার ভাববে। কারণ পরেরবার আমি তোমাকে মৌখিকভাবে সতর্ক করবো না।

ইব্রাহিম চেপে গেলো। মুখে সে যে ভাবই দেখাক, দীপুকে অল্প বিস্তর ভয় পায় সে। অধিকাংশ ভারতীয়ই বেশ ছোট খাটো, নিরীহ দর্শন। ইব্রাহিমের কৃতিত্বে তাদের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই ছেলেটি তাদের থেকে ভিন্ন। দেখলেই মনে হয় সমগ্র দুনিয়ার উপর তেতো হয়ে আছে।

দীপু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে। শেষ করতে বিকাল হবেই। একবার কাজে ডুবে গেলে সময়ের ঠিক থাকে না। ফোন বাজছে। নিশ্চয় আভা। রিসিভার তুলবার আগে দ্রুত ঘড়িতে চোখ বোলালো। সাড়ে এগারোটা!

পিংকির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো- ভাইয়া?

-হ্যাঁ। খবর কি তোদের? কাল রাতে কখন পৌঁছেছিলি?

-বারোটার দিকে। রাস্তার যা অবস্থা! দু'বার গাড়ী ঠেলবার মতো অবস্থা হয়েছিলো। ভালোয় ভালোয় যে পৌছেছি তাতেই রক্ষে। তোমার বাসায় ফোন করেছিলাম। কেউ ধরলো না। সেই বেয়াদপ মেয়েটা কোথায়?

-ঘুমাচ্ছে বোধহয়। কাল রাতে পার্কিং লটে লুকিয়ে ছিলো।

-সে বুঝেছি। যাবে আর কোথায়? কোন বেয়াদপি করার চেষ্টা করে নি তো কাল রাতে?

দীপু হেসে ফেললো - তোর শুধু ঐ চিন্তা। ও মানসিক ভাবে একটু বিপর্যস্ত হয়ে আছে।

-বিপর্যস্ত না ছাই। ওর এ্যাকটিং দেখলে গায়ে জ্বালা ধরে। একদম ভুলবে না ওর কথায়। কোন রকম গোলমালের আশংকা দেখলেই আমাকে ফোন করবে। বেঁধে নিয়ে আসবো। ফাজলামী করার জায়গা পায় না।

দীপু এবার সশব্দে হাসে। - তোর এতো ভয় পাবার কিছু নেই। আমি কচি খোকা নই।

-তোমার উপরে আমার কোন আস্থা নেই। সম্ভব হলে আজই ওকে আমার এখানে রেখে যাও। এক বাসায় এভাবে থাকাটা তোমাদের ঠিক নয়। চারদিকে দেশী মানুষের ছড়াছড়ি। কেউ জানলে সর্বনাশ!

-জানবে কি করে? আমার এখানে দেশী কাউকে চিনি না আমি।

-বাংলাদেশের মানুষদের দশজোড়া চোখ। কে কিভাবে জানবে টেরও পাবে না। চারদিকে লাগিয়ে বেড়াবে।

-আভাকে জিজ্ঞেস করবো। এতো বড় মেয়েকে জোর করে তো কিছু করানো যায় না। তার উপরে ওর জেদ কেমন সে তো জানিস।

পিংকির কণ্ঠে উষ্মা ফুটে উঠলো - করো তোমার যা ইচ্ছা। নিজের সর্বনাশ নিজেই করবে। আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে। পরে কথা হবে।

পিংকি লাইন কেটে দিলো। দীপু অসহায় ভঙ্গীতে শ্রাগ করলো। আভাকে নিয়ে তারও যথেষ্ট ভয়। কিন্তু জোর খাটানোও অসম্ভব। তাতে ফলাফল আরো মন্দ হয়ে যেতে পারে। সে বাসায় ফোন করলো। আভা ঘুম কাতুরে নয়। এতক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকার মেয়ে সে না। বার চারেক রিং হবার পর ফোন ধরলো আভা। -দীপু ভাই?

-হ্যাঁ। কি করছিলে? পিংকি ফোন করেছিলো, কেউ ধরেনি!

-গোছল করছিলাম। মাত্র বেরিয়েছি। শরীরে একটা সুতো পর্যন্ত নেই।

-আবার শুরু হলো।

আভা খুব হাসছে। - ফোন করেছেন কেন?

-কি করছো জানার জন্য। ফ্রিজে পাউরুটি, ডিম আছে।

-এসে ডিম ভেজে দিয়ে যান। অতিথিকে বিছানায় রেখে বেশ কাজে চলে গেছেন। কেমন ধরণের ব্যবহার এটা?

দীপু ঐ জাতীয় আলাপের ধার দিয়েও গেলো না। কাজে ফিরে যাবার তাগিদ অনুভব করছে সে। সংক্ষেপে বললো - বিকালের আগে ফিরছি না আমি। তরিতরকারিতো কিছুই নেই। একটা পিজার অর্ডার দিও লাঞ্চে। সাথে টাকা আছে তো?

-না। আমি খালি হাতে ড্যাং ড্যাং করতে করতে বোষ্টন চলে এসেছি।

-আমি ফোন রাখছি এখন।

-এতক্ষন বাসায় একা কি করবো আমি?

-ঘর দুয়ার পরিষ্কার করো। তাতে আমার একটু উপকার হবে।

-আহ্লাদ কতো!

-রাখি।

ফোন রেখে দিলো দীপু। প্রায় সাথে সাথে বেজে উঠলো সেটা। ধরলো না দীপু। সন্দেহ নেই, আভা। বার কতক বেজে থেমে গেলো সেটা। বাঁচা গেলো। স্বঃস্তির নিঃশ্বাস ফেললো দীপু।

অফিস থেকেই লাঞ্চের অর্ডার দেয়া হয়েছে। পিজা। ডেলিভারী হতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো সবাই। সুগন্ধি পনিরের লোভনীয় গন্ধে সারা অফিস মৌ মৌ করছে। ছুটির দিনে কাজ করলে এই লাঞ্চটি ফ্রি পাওয়া যায়। এই জাতীয় সৌজন্যমূলক আচরণ ভালোই লাগে। দীপু সেঁটে খেলো। সকালে সাধারণত নাস্তা করে না সে। দুপুরে অসম্ভব ক্ষুধার্ত থাকে। বাসায় একটা ফোন করবে কিনা ভাবলো। অকারণে কথার প্যাঁচে জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললো ও। কাজে ফিরে গেলো।

হালকা তুষার পড়তে শুরু করেছে আবার। ঝট্ করে বোঝা যায় না। কিন্তু কাঁচের জানালায় নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে লক্ষ্য করলে খুব সূক্ষ্ণ তুষারের কণা চোখে পড়ে। দীপুর পাশের কিউবটি জোল্লার। ভারতীয় মহিলা। দুই সন্তানের জননী। সে ঘন ঘন বাইরে তাকাচ্ছে।

-দীপু, আজকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনেছো নাকি?

-না কখনো শোনা হয় না। কেন?

-আমারও শোনা হয়নি। দেখে তো সুবিধার মনে হচ্ছে না। আমাকে আবার অনেক খানি পথ ড্রাইভ করতে হবে। এখনই চলে যাবো কিনা ভাবছি।

-তোমার কাজ কতদূর শেষ হয়েছে?

-বিশেষ একটা না। মন বসাতে পারছি না। ছেলে দুটো কি যে করছে। আমি আটকা পড়লে সর্বনাশ।

-রোজমেরীকে জিজ্ঞেস করে দেখো কি বলে?

জোল্লা ঠোঁট বাঁকালো। - তার সাথে আলাপ করতে আমার ইচ্ছা হয় না। সব সময় খোঁটা দিয়ে কথা বলবে।

দীপু চুপ করে গেলো। তার নিজের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর দু'টি বাগ্ সমাধা হলেই আজকের মতো তার ছুটি। যদি আবহাওয়া বিশেষ খারাপের দিকে মোড় না নেয়, তাহলে আভাকে নিয়ে আশে পাশে কোথাও থেকে ঘুরে আসা যায়। বোষ্টন প্রায় ত্রিশ মাইলের মতো দূর, অত দূর যাওয়ার ইচ্ছা তার নেই। এই রকম রাস্তায় ঘন্টাখানেকের উপর লেগে যাবে।

তিনটার দিকে আভার ফোন এলো। - দীপু ভাই, একটা সুখবর আছে।

দীপু প্রমাদ গুনলো। - কি সুখবর?

-আমার বাক্স ঘাটতে ঘাটতে জমিয়ে রাখা চিঠির একটা বান্ডিল পেয়েছিলাম। কি মনে হলো, উল্টে উল্টে দেখছিলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, ভাইয়ার নিজের হাতে লেখা একটা চিঠি পেয়েছি! বছর দেড়েক আগে লিখেছিলো। ধারণাও ছিলো না ওটা এখনো আমার কাছেই আছে।

দীপু কি বলবে বুঝতে পারছে না। আভার উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয়। সে অপেক্ষা করবারই সিদ্ধান্ত নিলো।

আভা উত্তেজিত কণ্ঠে বললো- দীপু ভাই, এর অর্থ কি বুঝতে পারছেন? ক্যাথি ম্যাকনামারা কি বলেছিলো আপনার মনে আছে? ভাইয়ার হাতে ছোঁয়া আছে এমন কিছু একটা নিয়ে যেতে। রুমাল, চিঠি এই জাতীয় জিনিষ খুঁজছিলো সে। গতকাল যা বলেছে আন্দাজের উপর বলেছে। কিন্তু এই চিঠিখানা পেলে সে নিশ্চয় আরো ভালো ভাবে বলতে পারবে।

দীপু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো।- তার কথা বিশ্বাস করবার কোন যৌক্তিকতা নেই।

-আপনার তো সব কিছুতেই অবিশ্বাস! আভার কণ্ঠস্বর ঝাঁঝালো।

দীপু নিরীহ গলায় বললো- আমাকে কি করতে বলো?

-আমি স্যালেম যাচ্ছি এখন। আপনার ইচ্ছা হলে আপনি আমার সাথে আসতে পারেন। কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

দীপু চমকে উঠলো।- এই আবহাওয়ায় তুমি আবার স্যালেম যাবে? তোমার কি মাথা ঠিক আছে?

-আপনাকে সাথে আসবার জন্য তো আমি সাধছি না। যাবার আগে জানিয়ে যাওয়াটা উচিৎ ভেবে ফোন করছি। হাজার হোক, ভাই তো আমার।

ভয়ানক খোঁচা।- যাবে কিভাবে?

-গাড়ী রেন্ট করবো একটা। ফোন গাইডে দেখলাম হোজমেরী ষ্ট্রিটের উপরেই একটা রেন্টাল পেস আছে। কতদূরে সেটা আপনার এপার্টমেন্ট থেকে?

দীপু চুলে হাত বোলালো। এই জাতীয় আলাপ অর্থহীন। সে জানে তাকেই যেতে হবে। আভা বললো- কি হলো। বোবা হয়ে গেলেন নাকি?

-আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।

-আপনাকে আসতে কে বলেছে?

দীপু ফোন রেখে দিলো। কম্পিউটার বন্ধ করে মিনিট খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লো ও। আভাকে নিয়ে ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ আছে। সে হয়তো সত্যিই একটি গাড়ী ভাড়া করে একাই রওনা দেবে। পথঘাট কিছুই চেনে না। কোথায় কি সমস্যায় পড়বে তার ঠিক আছে? আনিস সম্বন্ধীয় না হলে হয়তো ধমকিয়ে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতো দীপু, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেটি সম্ভব নয়।

ফ্রি ওয়েতে নামার মিনিট খানেকের মধ্যেই তুষারের বেগ বেড়ে গেলো। প্রায় অদৃশ্য কণাগুলি এখন দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। খুব শথ আদুরে ভঙ্গীতে বাতাসের শরীরে ভেসে বেড়াচ্ছে তারা।

দীপু বললো- আজ রাতেও তুষার পড়বে। এই সময়ে বের হওয়াটা উচিৎ হলো না। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে আসবে। রাস্তায় আটকা পড়লে ভালো সমস্যা হবে।

আভা বিরক্ত গলায় বললো- সব সময় এতো ঘ্যান ঘ্যান করেন কেন? তুষার কি আজ প্রথম দেখছেন নাকি? কাল আপনার অফিস আছে। আজ না গেলে আর যাওয়াই হতো না।

-একা একাইতো বেরিয়ে পড়ছিলে।

-জী না। একাকী আমি কোথাও যাচ্ছিলাম না। ভয় দেখানোর জন্য বলা।

দীপু রেডিও চালিয়ে দিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনার চেষ্টা করলো। খুব বেশী খুঁজতে হলো না। পূর্বাভাস বিশেষ সুবিধার নয়। গত কয়েকদিনের তুলনায় অবস্থা আরো মন্দ হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। কম করে হলেও আরো দুই থেকে চার ইঞ্চি তুষার পড়বে রাতে। আগামীকাল দুপুরের আগে থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আভা রেডিও বন্ধ করে দিলো। -ওদের কথা একটি সদ্যজাত শিশুও বিশ্বাস করে না। গবেটের দল।

-পথে সমস্যা হলে দেখো।

-কোন সমস্যা হবে না। মন দিয়ে গাড়ী চালান। নিজের দোষে খানা-খন্দে না পড়লে অন্য কোন বিপদ হবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না।

দীপু চুপ করে গেলো। 495 নর্থের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। রাস্তায় প্রচুর লবণ ছিটানো হয়েছে। কিন্তু তুষার পড়বার বিরতি না হলে রাস্তা পরিষ্কার করবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। প্যাচপেচে তুষারে টায়ার ডেবে যাচ্ছে। গতিবেগ পঞ্চাশের ঘরেই আটকিয়ে রাখতে হচ্ছে। কোথায় বরফ লুকিয়ে আছে জানার কোন উপায় নেই।

495 থেকে Route 3 নর্থ নিলো দীপু। এটিও একটি ফ্রিওয়ে। তবে এটাতে মাত্র দু'টি লেন। সাধারণত ফ্রিওয়ে গুলিতে ন্যূনতম তিনটি লেন থাকে। যানবাহন চলাচলের হারের উপরও এই সংখ্যা নির্ভর করে। Route 3 অবশ্য ব্যস্ত সড়ক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আফসোস করতে শুরু করলো দীপু। তুষারে ঢাকা রাস্তা। বিশেষ একটা মনোযোগ দেয়া হয়েছে বলে মনে হয়না। যানবাহনের সংখ্যা অবশ্য প্রচুর। ফলে গতি কমে গেছে ট্রাফিকের। ঢিমে তালে চলছে গাড়ীর লম্বা লাইন। আই 95 এ পৌছানোর এটি একটি শর্ট কাট পথ। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে

আজ সারারাত লেগে যাবে 95 এ পৌঁছাতে। তারপরও আরো অনেক খানি পথ যেতে হবে। এই রাতে গিয়ে ক্যাথি ম্যাকনামারাকে পাওয়া যাবে কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন। আভা মাঝে মাঝে এমন ছেলেমানুষী করে।

আভা বললো - এমন মন খারাপ করে ফেলছেন কেন? একটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে যাচ্ছি আমরা্ সেটা ভুলে যাবেন না।

-সময়টা খুব উপযুক্ত মনে হচ্ছে না। গিয়ে হয়তো মহিলাকে পাওয়া যাবে না।

-যাবে। তার সাথে ফোনে আলাপ করেছি আমি। রাত ন'টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে তার। সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

-তোমার ধারণা সে কিছু বলতে পারবে?

-চেষ্টা করতে দোষ কি? দেড় বছর ধরে এতো খোঁজাখুঁজি করেও তো কোন লাভ হয়নি।

-এই মহিলা গতকাল যা বলেছে আজ তারচেয়ে ভিন্ন কিছু বলবে, এমন ভাবছো কেন?

-কে জানে, বলতেও পারে।

-তুমি আসলে পজিটিভ কিছু শুনতে চাও তার মুখ থেকে। সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক।

-আপনি মনোবিজ্ঞানী এটা জানতাম না।

-তোমার মন বুঝতে মনোবিজ্ঞানী হতে হয় না।

-হ্যাঁ, খুব সবজান্তা হয়ে গেছেন।

দীপু চেপে গেলো। বিরক্তি ঢাকতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে তার। মাত্র চারটা বাজে। ইতিমধ্যেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তুষারের বেগ আরো বেড়েছে। শ্বেত কণাগুলি এখন আর ভেসে বেড়াচ্ছে না। যথেষ্ট বেগ নিয়ে অনেকটা বৃষ্টির ফোঁটার মতো টুপ টুপ করে পড়ছে। যদিও মন্দের ভালো এই যে ফোঁটাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব যথেষ্ট। এই দূরত্ব যতই কমতে থাকবে দৃষ্টি ততই অস্বচ্ছ হয়ে পড়বে, গাড়ির উইন্ডশীল্ডে তুষার জমতে থাকবে। দীপুর মুখ থম্থমে হয়ে উঠেছে। দিনের আলোতে তবুও সহনীয়, কিন্তু অন্ধকারে এইভাবে ড্রাইভ করা মানসিক অত্যাচার। আভা চুপ করে আছে। দীপুকে এই মুহূর্তে ঘাটাতে সাহস পাচ্ছে না সে। কিন্তু একটা বিশেষ ধরণের অস্বস্তি খুব ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করছে। বাসা থেকে যখন বের হয়েছিলো তখন টের পায়নি। এখন পাচ্ছে। কতক্ষণ দমন করা যাবে বোঝা যাচ্ছে না। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করলো। দীপুকে থামার কথা বললে সে নির্ঘাত ধমকে উঠবে।

চামফোর্ড পেরিয়ে যেতে গাড়ীর বহর বেশ হালকা হয়ে এলো। অনেকেই এক্সিট নিয়েছে। গতি এখনও চলিশের কোঠায়, কখনো আরো নীচে। দীপু কথা বলছে না। তার মনোযোগ রাস্তায়।

আভা খুক্ খুক্ করে কাশলো।- একটা কথা বলবো?

-বলো।

-রাগ করবেন না তো?

-এতো ভনিতা করছো কেন?

-আমার বাডার ফেটে যাচ্ছে।

দীপু ক্ষেপলো না। - পরের এক্সিটে বেরিয়ে যাবো। গ্যাস ষ্টেশন বা রেষ্টুরেন্ট জাতীয় কিছু একটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

আভা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে পড়ার চেয়ে যন্ত্রণাময় আর কিছু নেই।

দীপু ডানের লেনে চলে এলো। পরের এক্সিট ডান দিকেই আসবে। সাইনবোর্ডগুলো সব ঘন তুষারে ঢাকা। সুতরাং চোখ খোলা না রাখলে মিস্ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। সে গতিবেগ কমিয়ে ত্রিশে নিয়ে এলো। ওয়াইপার চালু করতে হলো। তুষারের বেগ আরেকটু বেড়েছে। আবহাওয়া পূর্বাভাসে তারা মিথ্যে বলেছে বলে মনে হচ্ছে না।

মাইলখানেক যেতে অস্বচ্ছ ভাবে একটি চিকণ সড়ক দেখতে পেলো দীপু। আরেকটু কাছে যেতেই সেটিকে একটি এক্সিট বলে চেনা গেলো। দেখে বিশেষ সুবিধার মনে হলো না ওর, তবুও ফ্রিওয়ে থেকে বেরিয়ে এলো। চিকণ, বাঁকানো রাস্তা, তুষারে সম্পূর্ণ আবৃত। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটি বিশেষ ব্যবহৃত রাস্তা নয়। কেউ এটিকে পরিষ্কার করবারও প্রয়োজন বোধ করেনি। আধমাইলটাক যেতে অন্য একটি রাস্তায় গিয়ে মিশলো এটি। দীপু একটু থমকে গেলো। এই রাস্তাটির দু'পাশে ঘন বন! ডানে কিংবা বাঁয়ে কোথাও কোন জনপদের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। এদিকে এখনও প্রচুর বিরান এলাকা রয়েছে। কিন্তু এই রাতে নিজেদেরকে তেমন একটি এলাকায় কল্পনা করবার কোন ইচ্ছা দীপুর নেই। সে বললো- এদিকে কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

আভা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বললো- চলেন একদিকে। একটা বাসা পেলেও থামা যায়।

-এই রকম পরিবেশে কারো বাসায় গেলে গুলি করে মারবে। বিদেশীদের অনেকেই তেমন বিশ্বাস করে না।

-গুলি করলেও সই। আমার অবস্থা খুবই খারাপ।

দীপু বামে ঘুরলো। যা আছে কপালে। দু'পাশে ঘন পাইপের বন। জনমনিষ্যির কোন চিহ্ন নেই কোথাও। মাইল তিনেক পথ পেরিয়ে গেলো ওরা। কোন পরিবর্তন নজরে এলো না। এই পথ কোথায় গেছে তাও পরিষ্কার নয়। দীপু বললো- কি করবে?

-আরেকটু সামনে চলেন। কিছু একটা না থেকেই পারে না।

-দেখে তো কানা এক্সিট মনে হচ্ছে। তুষারে ঢাকা থাকায় সাইনবোর্ড দেখতে পাইনি। সেখানে নিশ্চয় লেখা ছিলো।

-একটা কাজও যদি আপনি ঠিক মতো করতে পারেন।

-এখন আমার দোষ দিচ্ছো?

আরো আধমাইল যেতে একটি গ্যাস ষ্টেশন পাওয়া গেলো। কিন্তু সেটি গত এক সপ্তাহে খোলা হয়েছে বলে মনে হলো না। তুষারে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। দীপু অস্বস্তি নিয়ে বললো- আর মাইলখানেক যাই। তারমধ্যে কিছু না পেলে অন্য কোন উপায় দেখতে হবে। এই রাতে এমন অচেনা পথ ধরে বেশী দূরে যাওয়াটা নিরাপদ নয়।

আভা তিক্তস্বরে বললো- অন্য উপায় বলতে কি বোঝাতে চাইছেন?

-বুঝতেই তো পারছো।

-হ্যাঁ, আপনার সামনেই জামা-কাপড় খুলে....

-ব্যস, ব্যস। সমস্যা তোমার, আমার নয়।

দীপু খুব ধীর গতিতে চলছে। দু'পাশে ঘন জঙ্গল থাকায় রাস্তাটি আরো অন্ধকার হয়ে উঠেছে। হেড লাইটের আলোতে খুব বেশীদূর দৃষ্টি চলছে না। তুষারের ঘনত্বও অনেকখানি বেড়ে গেছে। সোজা রাস্তায় সমস্যা হয় না। কিন্তু বাঁকগুলি অনেক সময় ভালোভাবে দেখা যায় না। এতো সতর্ক থাকা সত্ত্বেও ভুল করে ফেললো দীপু। বাঁকটি যেখানে শুরু হয়েছে বলে ভেবেছিলো সেটা ভুল। আরো অন্তত পাঁচ ছয় ফুট এগিয়ে যাওয়ার দরকার ছিলো। বাঁক ঘুরতে শুরু করেই বিপদ টের পেলো দীপু। রাস্তার পাশে হালকা হয়ে জমে থাকা বরফের চাঙগুলি ভাঙতে শুরু করেছে। দ্রুত ষ্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলো সে; কিন্তু বিশেষ সুবিধা হলো না। নীচের দিকে গড়াতে শুরু করেছে গাড়ী। প্রায় ফুট ছয়েক ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নীচে নামলো গাড়ীটি, একটি পাইন গাছের কান্ডে হালকা একটি ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়ালো। দীপু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। গাড়ীর শারীরিক কোন ক্ষতি হয়নি। আভা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো- শেষ পর্যন্ত খাদের মধ্যেই নামিয়ে দিলেন।

-ইচ্ছে করে নামিয়েছি নাকি?

-এখন গাড়ী রাস্তায় তুলবেন কি করে? এই তুষার ভেঙে ওপরে তুলতে হলে টোয়িং ট্রাক লাগবে। এতক্ষণে একটা কাজের কাজ করেছেন। মনে আনন্দ হচ্ছে এখন?

দীপু বিপদের পরিমাণটা আঁচ করতে পারছে। এই পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে হাজার চেষ্টা করলেও গাড়ী ওপরে তোলা সম্ভব হবে না। আভা ঠিকই বলেছে। সে ড্যাশবোর্ড খুললো। কপাল ভালো সেলুলারটা নিয়েছিলো মাসখানেক আগে। কখনো ব্যবহার করতে হবে ভাবেনি।

আভা সেলুলার দেখে সামান্য নমনীয় হলো।- তবুও ভালো। এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে সারারাত পচতে হবে না। অকর্মার ধাড়ী। দেখে শুনে খানা-খন্দে ফেললো। ছিঃ ছিঃ।

সেলুলার থাকায় বিশেষ সুবিধা হলো না। সময়মতো চার্জ করতে ভুলে গেছে দীপু। অপরাধী মুখে সেটাকে ড্যাশবোর্ডে ফেরত পাঠালো দীপু। আভা স্তব্ধ ভঙ্গীতে ওকে পরখ করছে। - চার্জ নেই?

দীপু ঘাড় নাড়লো। আভা জানালার কাঁচে কপাল ঠুকলো। - কোন দুঃখে আপনার সাথে বেরিয়েছিলাম আমি।

-আমার কি দোষ? তুমিই তো সমস্যা করলে।

-আপনাকে এই কানা এক্সিটে কে ঢুকতে বলেছিলো? এতোদিন এখানে আছেন পথ ঘাট চেনেন না কেন?

দীপু ম্যাপ বের করলো। বিশেষ সুবিধা হলো না। এটি কানেকটিকাট, ম্যাসাচুসেটস এবং রোডস আইল্যান্ডের সম্মিলিত ম্যাপ। এই সামান্য এক্সিট এই ম্যাপে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আভা ক্ষ্যাপা কণ্ঠে বললো- এর চেয়ে ভালো কোন ম্যাপ নেই আপনার? বোষ্টনের একটা ম্যাপ রাখতে কি সমস্যা হয়েছিলো?

দীপু মাথা চুলকালো।- অযথা ক্ষেপে গিয়ে কোন লাভ নেই। একটা উপায় নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

-আমি তো কোন উপায় দেখছি না। Route 3 থেকে কম করে হলেও চার মাইল সরে এসেছি আমরা। এই তুষারে এতোখানি পথ হেঁটে যেতে দুই তিন ঘন্টার কম লাগবে না। যখন সেখানে পৌঁছাবো ততক্ষণে ফ্রষ্ট বাইট হয়ে যাবে আমাদের।

ফ্রষ্ট বাইটের চেয়েও বড় কয়েকটা সমস্যা রয়েছে। এতোখানি পথ ঠেঙিয়ে Route 3 তে পৌঁছালেই সমস্যা মিটবে না। রাত সাতটা আটটার সময় এই রকম আবহাওয়ায় রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা হয়ে পড়ে। সৌভাগ্যবশত কেউ দেখলেও গাড়ী থামাবে না। এদেশে হাইওয়েতে অহরহ খুন-খারাবী হয়, কেউ কখনো ঝুঁকি নেয় না। বিপদগ্রস্ত পথচারীদের জন্যেও সেটি সমস্যা। কেউ গাড়ী থামালেও তার উদ্দেশ্য ভালো কি মন্দ বুঝবার কোন উপায় নেই। তার উপরে রয়েছে গাড়ী চাপা পড়বার ভয়। প্রতিবছরই বেশ বড় সংখ্যার মানুষ ফ্রিওয়েতে গাড়ীর ধাক্কায় মারা যায়। দীপু ঐ জাতীয় ঝুঁকি নিতে আগ্রহী নয়। সে একা থাকলে তবুও ভাবা যেতো, কিন্তু একটি মেয়েকে সঙ্গী করে এই জাতীয় ঝুঁকি নেয়া যায় না। খুব শান্ত মাথায় অন্যান্য সম্ভাবনাগুলি বিচার করে দেখবার চেষ্টা করছে সে। আভা দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো। -বাডার ফাঁকা করা দরকার আমার। আপনি কি দয়া করে আমার সাথে একটু আসবেন? এই অন্ধকারে কোথাও পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙতে চাই না।

দীপু তার সঙ্গ নিলো। দীপুকে দু'টি পাইনের পেছনে দাঁড় করিয়ে ঘন হয়ে জমানো একটি ঝোপের আড়ালে চলে গেলো আভা। মোটা একটি জ্যাকেট নিয়ে এসেছে দীপু। মিনিট পাঁচেকেই তুষারে প্রায় ঢেকে গেলো সেটি। মনে মনে বিপদ ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে। গাড়ীতে সারারাত বসে থাকা যাবে না। তেল যেটুকু আছে তাতে হিটার চালিয়ে রাখলে ঘন্টা দুই-তিন চলবে। ভেবেছিলো স্যালেম পৌঁছে ট্যাংক ভরবে। সবকিছুই কেমন গোলমেলে হয়ে গেছে। নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে পাওয়াটা বিশেষ রকম জরুরী। এই ঠান্ডায় দশ বারো ঘন্টা শুধুমাত্র জ্যাকেট গায়ে দিয়ে শীতল গাড়ীর ভেতরে বসে থাকা এককথায় অসম্ভব। তাপমাত্রা শূন্যের দশ পনেরো ডিগ্রী নীচে নেমে যেতে পারে। তার সাথে সামান্য বাতাস যোগ হলে ষোল আনা পূর্ণ হয়।

আভা ফিরতে দেরী করছে।

দীপু লজ্জার মাথা খেয়ে ডাকলো- এই আভা! আভা!

তুষারে ভারী পদক্ষেপ শোনা গেলো। আভার অন্ধকার অবয়ব দেখা গেলো।

-ডাকাডাকি করছেন কেন?

-এতক্ষণ হয়ে গেছে! ভাবলাম কোন বিপদে পড়লে কিনা?

-এখনো ভাবছেন! কেন, আমাকে দেখে মনে হচ্ছে না আমি বিপদে পড়েছি? সারারাত এই ঠান্ডায় থাকতে হলে জমে বরফ হয়ে যাবো। বুদ্ধি কিছু পেলেন? যদি হাঁটতেই হয় তাহলে সময় নষ্ট করবার অর্থ হয় না।

দীপু বললো- তার আগে আশেপাশে একটু চক্কর মেরে দেখা যাক। হয়তো কোন বাসাটাসা পাওয়াও যেতে পারে।

-গুলি-টুলি করে বসবে না তো?

-সেই সম্ভাবনা তো আছেই? তুমি গাড়ীতে বসো। আমি আধঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবো।

আভা অবিশ্বাস নিয়ে বললো - এই অন্ধকারে আমি একাকী গাড়ীতে বসে থাকবো? আপনার মাথা ঠিক আছে তো? যা করতে হয় দু'জন একসাথেই করবো।

দীপু গাড়ীর ষ্টার্ট বন্ধ করে দিলো। সাথে একটা টর্চ না রাখার জন্য নিজেকে সমানে গালমন্দ করে চলেছে সে। পকেটে একটি লাইটার থাকায় তবুও রক্ষে। নিতান্ত

বিপদে পড়লে আগুন ধরিয়ে শরীর গরম রাখা যাবে। যদিও আগুন ধরানো সম্ভব হবে কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন।

১৫

ঘন্টাখানেক খোঁজাখুঁজি করেও বিশেষ সুবিধা হলো না। শেষ পর্যন্ত ওরা পেছনে ফেলে আসা গ্যাস ষ্টেশনটিতে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো। বড়জোর আধমাইল হবে। মুষলধারায় তুষার পড়তে শুরু করেছে। দৃষ্টি প্রায় চলেই না। শরীর ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটছে ওরা। পুরু চামড়ার বুট থাকা সত্ত্বেও পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। কথা বলবার চেষ্টা করছে না কেউ। চারিদিকের এতো শব্দের মাঝে কথা চালাতে হলে রীতিমতো চীৎকার করতে হবে। গ্যাস ষ্টেশনটি খুবই ছোট। মাত্র দু'টি পাম্প। দেখে অচল মনে হলো। পুরু কাঁচের দরজায় তালা। ভেতরে জিনিষপত্র প্রায় কিছুই নেই। দেখেই বোঝা গেলো ষ্টেশনটি সম্ভবত বন্ধ হয়ে গেছে। এই বনজঙ্গলের মধ্যে গ্যাস স্টেশন খোলার অর্থ কি?

দরজা ভাঙার চেষ্টা সফল হলো না। দু'জনে প্রচুর লাথালাথি করে সেই চেষ্টায় ইতি টানলো। দীপু হতাশ কন্ঠে বললো- এই দরজা ভাঙতে হলে হাতুড়ী লাগবে। লাঠি-সোটা দিয়েও বিশেষ সুবিধা হবে না।

আভা শরীর কুঁচকিয়ে তীব্র বাতাসের ঝাপটা থেকে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছে। - আপনার গাড়ীতে জ্যাক নেই?

দীপু মাথা দোলালো-আছে। কিন্তু সে তো পাক্কা এই মাইলের ধাক্কা! আমার হাতের আঙুল এর মধ্যেই জমে যাবার দশা হয়েছে।

-এখানে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করে তো লাভ নেই।

-বাথরুমটা চেক করে দেখা যাক। দীপু প্রায় দৌড়ে গ্যাস ষ্টেশনের পেছনের অংশে চলে এলো। আভাও তার পিছু নিলো। বাথরুমের কাঠের দরজায় একটি ক্ষুদে তালা ঝুলছে। বার দশেক লাথি পড়তেই আংটা খুলে এলো। আভা ইতস্তত ভঙ্গীতে বললো- ভেতরে যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে আমি ওর মধ্যে ঢুকছি না।

দীপু শ্রাগ করলো। - থাকো বাইরে দাঁড়িয়ে।

ভেতরে উঁকি দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। কোন দুর্গন্ধ নাকে ঝাপটা দিলো না। অন্ধকারে দৃষ্টি সামান্য সয়ে আসতে দেখলো আকারে অতিমাত্রায় ছোট কামরাটি। বড়জোর ছয় বাই ছয়।

আভা তার ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিলো-খুব ছোট যে!

-এছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। সদর দরজা ভাঙার চেয়ে বাথরুমের দরজা ভাঙা অনেক নিরাপদ। আজকের রাতটা কষ্ট করে এখানেই কাটিয়ে দেয়া যাক। দরজাটি থাকায় বাতাসের হাত থেকে খানিকটা রক্ষা পাওয়া যাবে।

আভা ভেতরে ঢুকে পড়লো। -আর পারছি না, বাবা। আমার শরীর জমে যাচ্ছে। একটু আগুন ধরানোর ব্যবস্থা করতে পারেন!

দীপু বললো- বেশী ঠান্ডা লাগলে একটি সিগ্রেট টানো। তাতে খানিকটা উপকার হবে।

-মরে গেলেও না। আপনিও যেন এই ঘরের মধ্যে ঐ ছাইভস্ম ধরাবেন না।

দীপু বাইরে দাঁড়িয়েই একটা সিগ্রেট ধরানোর চেষ্টা করতে লাগলো। বাতাসে লাইটারের ছোট্ট শিখা বার বার নিভে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আশা ছেড়ে দিলো ও। লাইটারে গ্যাস খুব বেশী নেই। সিগ্রেটটা পায়ের নিচে পিষে ফেললো ও। ছোট্ট ছোট্ট কিছু কাঠ জোগাড় করে ফিরে এলো।

ভেজা কাঠে আগুন ধরাতে অনেক খানি সময় কেটে গেলো। ধোঁয়ায় সমানে কাশছে আভা। দরজাটা সামান্য ফাঁক করতেই এক ঝাঁক তুষার ফুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। নিভে গেলো আগুন। দীপু হতাশ কণ্ঠে বললো - এই বন্ধ ঘরে আগুন জ্বালানোটা ভালো বুদ্ধি নয়। তারচেয়ে বরং চুপচাপ বসে থাকি। আমাদের শরীরের উত্তাপে ঘরটা খানিকটা হলেও গরম হয়ে উঠবে।

আভা দুই হাঁটুর মাঝখানে মুখ ঢেকে গুটিসুটি হয়ে বসেছিলো। সে বাঁকাস্বরে বললো-হ্যাঁ, আপনার যতো উদ্ভট কথা! তার চেয়ে আমার শরীরের সাথে আরেকটু ঘেঁষে বসেন। তাতে যদি আমার একটু উপকার হয়। সামান্য একটা খানা চোখে দেখেন না! ছি! ছি!

দীপু আভার শরীর ঘেঁষে বসলো। তার নিজের দেহও ঠান্ডা হয়ে আছে। এই রকম শীতল বাতাসে জ্যাকেট, গোভসও বিশেষ কোন কাজে লাগে না। ঠান্ডার তীক্ষ্ণ সূঁচ সবকিছু ভেদ করে ঢুকে পড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটে। বাইরে বাতাসের বেগ অনেক খানি বেড়ে গেছে। তীব্র সোঁ সোঁ নিনাদ রীতিমতো ভীতিকর শোনায়। দু'পা দিয়ে কাঠের দরজাটি আটকিয়ে ধরে রেখেছে দীপু। বাতাসের ধাক্কায় থরথরিয়ে কেঁপে উঠছে দরজাটা। দু'এক চিলতে অসম্ভব শীতল বাতাস ফাঁক ফোঁকর গলে ভেতরে ঢুকে পড়ছে। হাড় মজ্জা পর্যন্ত কেঁপে উঠছে তাতে। আভাকে চুপচাপ থাকতে দেখে একটু ভয় পেয়ে গেলো দীপু। - আভা, তুমি ঠিক আছো তো?

-হ্যাঁ, খুব আনন্দে আছি।

-কথা বলো। তাতে ঠান্ডার প্রকোপটা ভুলে থাকবে।

-এখন অতোখানি ঠান্ডা লাগছে না। আপনি আমার পিঠে একটু ম্যাসেজ করে দেবেন? মনে হচ্ছে যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

দীপু আভার জ্যাকেটের উপর দিয়ে বেশ জোরের সাথে হাত ডলতে লাগলো। মিনিট দু'তিনেই কাজ হলো। আভা স্বস্তি নিয়ে বললো - আপনাকে অনেক মন্দ কথা বলি। মনে কিছু নেন না তো?

-হঠাৎ এই সময়ে ও সব কথা কেন?

-এই ঝামেলাতো আমার জন্যেই হলো। অথচ আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছিলাম।

-আমার ধারণা আমাকে ক্ষেপানোর জন্যই তুমি ঐ জাতীয় কথা বলে থাকো।

-আপনাকে ক্ষেপিয়ে এতো মজা পাই কেন বলেন তো?

-কারণ তুমি জানো আমি কখনো তোমার কোন ক্ষতি করবো না। আমার সান্নিধ্যে তুমি নিরাপদ বোধ করো। আমি তোমাকে ধমক-টমক দিলেও সেই কারণে তুমি গায়ে মাখো না।

-আপনি সব সময় এমন মনোবিজ্ঞানী মার্কা কথা বলেন কেন? এতো গালভরা কথাবার্তা কোন মেয়েই পছন্দ করে না।

-মেয়েরা যা পছন্দ করে আমাকে তাই করতে হবে নাকি?

-না করার ফল তো নিজ চোখেই দেখছি।

দীপু শ্রাগ করলো। আভা তার পেটে কনুইয়ের একটি মোক্ষম গুতা দিলো।

-রাগ করলেন নাকি?

-তোমার উপরে রাগ করা অর্থহীন।

-এতোদিনে পথে আসছেন তাহলে। আভা মিটি মিটি হাসছে। দীপুর ঠোঁটেও সেই হাসি সংক্রামিত হলো।

-হাসছো কেন?

-জানিনা। এমনিই হাসছি। নারকেল বাগানের কথাটাও একটু একটু মনে পড়ছে।

-এখন যদি জাপটে ধরে চুমু খাই কি করবে তুমি?

-বাঁচাও, বাঁচাও বলে চীৎকার করবো।

-আশপাশে জন মনিষ্যির কোন চিহ্ন নেই। কেউ তোমার চীৎকার শুনবে না।

-আপনাকে পিটিয়ে তক্তা বানাতে জন মনিষ্যি লাগে নাকি? আমি একাই যথেষ্ঠ।

দীপু হেসে ফেললো। - নারকেল বনের কথা উঠতেই আনিসের কথা আমার খুব মনে পড়ে। আমার উপরে যা ক্ষেপেছিলো ও। এমনিতে এমন ঠান্ডা ছিলো ও। চিন্তাও করিনি এতো রেগে যাবে।

-আমিও কিন্তু ভাইয়াকে খুব একটা রাগতে দেখিনি কখনো। সবসময়ই চুপচাপ, অভিমানী। কম বেশী আপনার মতই ছিলো ও।

-আমার কিন্তু ভয়ানক রাগ।

-বাজে কথা বলবেন না। ন্যাংটাকাল থেকে দেখে আসছি। আপনাকে আমার চেয়ে বেশী আর কে চেনে।

-কাউকেই সম্পূর্ণভাবে চেনা যায় না আভা। আনিস তোমার একমাত্র ভাই ছিলো। ওকেও কি তুমি খুব ভালভাবে চিনতে? আমি ওর সম্বন্ধে যা জানি তুমি তার অর্ধেকও জানো না।

-আবার দার্শনিকের মতো সংলাপ দিচ্ছেন! ভাইয়ার সম্বন্ধে কি এমন গোপন তথ্য জানতেন আপনি?

-সে সব তোমাকে বলা যাবে না।

-নিশ্চয় নারী সংক্রান্ত। ঠিক কিনা?

-বলা যাবে না।

-ঠিক আছে, বলতে হবে না। পুরনো কেচ্ছা ঘাটার ইচ্ছা আমার নেই। ওর একটা হদিস পেলেই আমি খুশী হতাম।

দীপু একটু চুপ করে থেকে বললো - একটা সময় ছিলো যখন ও ছুরি, পিস্তলের প্রতি প্রচন্ড ঝুঁকে পড়ে। বহুদিন ওর কোমরে আমি পিস্তল গোঁজা দেখেছি। নামী পিস্তলবাজ হবার স্বপ্ন দেখেছে ও। পরে অবশ্য সেই সখ উবে যায়। কিন্তু ওর মৃত্যুর পেছনে ঐ জাতীয় কোন কারণ থাকাও অসম্ভব মনে হয় না।

আভা সন্দিহান কণ্ঠে বললো - দীপু ভাই,আপনি কি বলতে চাইছেন?

-আমি একটা সম্ভাবনার কথা বলছি। এমনওতো হতে পারে খুব বাজে একটি চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলো। ক্ষমতার প্রতি ওর মোহ ছিলো। আমি অন্তত সেটা খুব ভালো করে জানি।

আভা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো - এই পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু ওর লাশটাও খুঁজে পাওয়া গেলো না, এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে? এটা সত্যিই দূর্ঘটনা নাকি ষড়যন্ত্র সেটাও হয়তো কোনদিনই জানা যাবে না। দেশে ফিরে গিয়ে আমি নিজেও যে কতখানি নিরাপদ থাকবো কে জানে? বড় ভয় হয় দীপু ভাই। বেশ ছিলাম এখানে। ফিরে যেতে ভয় হয়।

দীপু কিছু বললো না। আভার ভয় অমূলক নয়। তার পরিস্থিতিতে পড়লে সে নিজেও আতংকিত হয়ে পড়তো।

আভা ফিসফিসিয়ে বললো - আপনি কি এখানেই থেকে যাবেন দীপু ভাই?

-হয়তো। দেশে গেলেই সব কিছুর উপরে প্রচন্ড ক্ষোভ হয় আমার। কোথাও কোন কিছুই যথাযথ মনে হয় না। অসম্ভব মানসিক কষ্ট পাই। এখানে থাকলে সেই কষ্ট তেমন তীব্র হয় না।

-সব সময় এমন দেশ দেশ করেন কেন?

-কি করবো? দেশের পরিচয়েইতো আমাদের পরিচয়।

আভা চাঁপাস্বরে বললো - আপনি আস্ত পাগল।

দীপু বললো - শুধু আমিই যদি পাগল হবো তাহলে তুমি কেন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাও?

আভা চোখ ছোট করে ফেললো। - আপনাকে কে বললো?

-সব খবরই পাই।

-কে বললো তাই বলেন। এই কথা তো বোষ্টনে থেকে আপনার জানবার কোন উপায় নেই।

-কেন গিয়েছিলে তাই বলো।

-সব কথা আপনাকে বলতে হবে নাকি?

-না বললেও যে আমি জানবো না, তা তোমাকে কে বললো?

-আপনার যা ইচ্ছা আপনি আন্দাজ করে নিন।

-সাইকিয়াট্রিষ্টের কাছে যাওয়াটা দোষের কিছু নয়। আমাদের সবারই নানান রকম মানসিক সমস্যা আছে। কেউ স্বীকার করি কেউ করি না।

-অর্থাৎ আমি মানসিক রোগী।

কনুইটি এগিয়ে আসতে দেখলো দীপু। কিন্তু সময়মতো সরতে পারলো না। পাঁজরে এসে লাগলো। কাৎরে উঠলো ও। আভা চিবিয়ে বললো - এর পরেরবার পাঁজর ভেঙে হাতে ধরিয়ে দেবো।

-আমাকে মারলে তোমার মানসিক সমস্যা যাবে?

-আবার!

দীপু হাত জোড় করলো।

আভা একটু ভেবে বললো - আপনি নিশ্চয় আবোল তাবোল কিছু একটা ভেবে বসে আছেন?

-হয়তো। জানোইতো আমার মন কত ছোট।

-ফাজলামী করবেন না। এই বিয়ের ব্যাপারটা ওঠা অবধি আমার মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু বিয়ে হলেও হতো, বাবার ব্যবসাও দেখতে হবে! এক সাথে দুই ধাক্কা। এখানে চাকরী বাকরী করছি, নিজস্ব একটা জীবন গড়ে উঠেছিলো। সেই সব ছেড়ে অচেনা অজানা একটি ছেলেকে বিয়ে করতে হবে, বিশাল এক গোলমেলে ব্যবসায় নাক গলাতে হবে - এই সব হাজারটা চিন্তা মাথায় ঢুকে এমন জট পাকিয়ে গেছে। কিছুই ভালো লাগে না আমার। ভাইয়ার উধাও হয়ে যাবার রহস্যটারও কোন সমাধান হলো না। এসব আপনি কি করে বুঝবেন? আছেন নিজের জগতে।

-সাইকিয়াট্রিষ্ট দেখিয়ে কোন উপকার হলো?

-আবার ঠাট্টা করছেন?

দীপু হাত উঁচিয়ে আত্মসমর্পনের ভঙ্গী করলো। - মাফ চাই। তোমাকে ক্ষেপিয়েও আমার যথেষ্ট আনন্দ হয়।

-তাতো হবেই। ছোটলোক!

-শেষ পর্যন্ত তো সেই ছোটলোকের কাছেই ছুটে আসা।

-আপনি তাই ভেবেছেন বুঝি?

-মিথ্যে ভেবেছি?

-স্বপ্নের জগতে বাস করছেন। আমি এসেছিলাম উইচদের সাথে দেখা করবার জন্য।

-দেখা তো গতকাল হয়েছিলো। তারপরও থেকে গেলে কেন?

-থাকলাম কারণ আপনার সম্বন্ধেও আমি কিছু কথা শুনেছি। সেগুলো যাঁচাই না করা পর্যন্ত ঘুম হচ্ছিলো না।

-কি শুনেছো?

-শুনেছি একটি শ্বেতাঙ্গিনীর সাথে খুব নেচে গেয়ে বেড়ানো হচ্ছে।

-এই কথা তোমাকে কে বললো?

-আমিও সব কথাই জানতে পাই। তার নাম পর্যন্ত জানি। এলিসা। কি ব্যাপার মুখখানা এমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে কেন?

-কি আবোল তাবোল কথা বলো। আমরা স্রেফ বন্ধু। মাঝে মাঝে একসাথে ঘুরে বেড়াই।

-তাই বুঝি? তাহলে এমন লুকিয়ে চুরিয়ে ঘোরা হয় কেন?

-মোটেই লুকিয়ে চুরিয়ে ঘোরা হয় না।

-বেশ ভালো। দেশে গিয়ে আপনার আম্মাকে এই কাহিনী বলতে হবে। বন্ধু বই তো কিছু নয়। প্রত্যেক উইক এণ্ডে রেষ্টুরেন্ট, মুভি। গাধা পেয়েছেন আমাকে?

দীপু প্রমাদ গুনলো। - খবরদার, মাকে এইসব কথা বলবে না। ফোন করে আমার জীবনটি বারো ভাজা করবে।

-তাহলে বলেন এলিসার সাথে আপনার কি সম্পর্ক?

-তা নিয়ে তোমার এতো মাথা ব্যথা কেন?

-জনের সাথে আমার যখন খাতির ছিলো তখন আপনার ঘুম হতো না কেন?

-এই কথা সত্যি না।

-মিথ্যে বললে আবার কনুই খাবেন।

-খবরদার। গতবার বেশ ব্যথা লেগেছে।

-তাহলে সত্যি কথা বলেন।

-বললাম তো একবার। আমরা স্রেফ বন্ধু।

-ওকে ছুঁয়েছেন কখনো?

-প্রশ্নই ওঠে না।

-কসম কেটে বলেন।

-কসম কাটতে হবে কেন?

আভা ঠোঁট বাঁকালো - মিথ্যুক কোথাকার!

দেয়ালে মাথা রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করছে আভা। দীপু বললো- আমার কাঁধে মাথা রাখো।

আভা গরগরিয়ে উঠলো - মিথ্যুক!

দরজা বন্ধ রাখতে রীতিমতো শক্তি খরচ করতে হচ্ছে দীপুকে। বাতাসের বেগ মনে হচ্ছে যেন আরো বেড়েছে। ঠান্ডার প্রকোপ খানিকটা সয়ে এসেছে। পায়ের আঙ্গুল নাড়িয়ে সতেজ করতে হচ্ছে একটু পর পর। ঘড়ি দেখলো দীপু। রাত সাড়ে এগারোটা। সময় যেন খুব ঢিমে তালে চলছে। আভা সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। দীপুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে সে। দীপুর কোলে মাথা রেখেছে। দীপু মেয়েটির চুলের গন্ধ শুকলো। পরিচিত অথচ প্রিয় গন্ধ। এই মেয়েটিকে এমনিভাবে জড়িয়ে রাখবার অধিকার পেলে আর কিছুই চাইতো না সে।

১৬

প্রচন্ড ঠান্ডায় ঘুম ভাঙলো দীপুর। আধখোলা দরজা দিয়ে বরফের মতো ঠান্ডা বাতাস হু-হু করে ঢুকছে। ক্ষীপ্রগতিতে পা দিয়ে দরজাটি আটকে ধরলো ও। ওকে জড়িয়ে ধরে থর্ থর্ করে কাঁপছে আভা। তার মুখের ফ্যাকাশে ভাব দেখেই ভয় পেয়ে গেলো দীপু। হাত থেকে গোভস খুলে ফেললো। আভার মুখ অসম্ভব শীতল। শ্বাস-প্রশ্বাস বেশ ধীর। সজোরে ওর গালে হাত ঘষতে লাগলো দীপু। আভার গোভস খুলে হাতে হাত ডলতে লাগলো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে যথেষ্ট সুস্থ মনে হলো আভাকে। সে গুঙিয়ে উঠলো। - কি ঠান্ডারে বাবা! আমার পায়ে কোন সাড়া পাচ্ছি না।

দীপু দ্রুতহাতে আভার বুট এবং মোজাজোড়া খুলে ফেললো। মিনিট খানেক ঘষতেই কাজ হলো। অনুভূতি ফিরে পেতে শুরু করলো আভা। আবার মোজা এবং বুটজোড়া স্বস্থানে ফিরে গেলো।

আভা বললো- ক'টা বাজে?

ঘড়ি দেখলো দীপু- সাড়ে পাঁচ। একটু পরেই আলো ফুটতে শুরু করবে।

-এইখানে বসে থাকলে ঠান্ডায় মরে যাবো আমি।

-আলো ফুটলেই বেরিয়ে পড়বো আমরা। হেঁটে Route 3 পর্যন্ত যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।

-ভালো বিপদে ফেলেছি আপনাকে, তাই না?

-কথাটা ঠিক নয়। তোমাকে এইভাবে জড়িয়ে ধরে বসে থাকবার সুযোগ খুব একটা হয় না।

আভা চোখ মটকালো ।- যেন, এর আগে দু'একবার হয়েছে ।

দীপু হেসে ফেললো ।- এতে যে এতো মজা আগে জানতাম না ।

আভা ঠোঁট বাঁকালো ।- না, জানতেন না! এলিসা তাহলে কি জন্যে!

-আবার এলিসা!

আভা উঠে পড়লো ।- চলেন, রওনা দেই । এখানে এই ঠান্ডার মধ্যে বসে বসে আপনার সাথে ঝগড়া করার কোন অর্থ হয় না ।

দীপুও উঠে পড়লো । দরজা খুলতেই বাতাসের শীতল ঝাপটা শরীর কাঁপিয়ে দিয়ে গেলো । অন্ধকার এখনও প্রায় নিশ্চিদ্র । খুব মলিন একটি আলোর পরশ আকাশে । দৃষ্টি প্রায় চলে না বললেই হয় ।

দীপু বললো- আরেকটু অপেক্ষা করাটাই বোধহয় উচিৎ ।

আভা বললো- ঐ ভাবে বসে থাকলে আমি জমে বরফ হয়ে যাবো । হাঁটতে থাকলে তবুও খানিকটা স্বস্তি লাগবে ।

পরস্পরকে প্রায় জড়িয়ে ধরে খুব সতর্কপায়ে তুষার ভেঙে এগিয়ে চললো ওরা । কম করে হলেও আট থেকে নয় ইঞ্চি তুষার পড়েছে সারারাতে । এখনও মুষলধারে পড়ছে । রাস্তায় পুরু হয়ে জমে আছে তুষারের পর্দা । বুটের প্রায় সম্পূর্ণটাই ডেবে যাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে । হাঁটতে রীতিমতো সাধনা করতে হচ্ছে ওদেরকে । সবচেয়ে সমস্যা করছে বাতাস । বিশেষ করে কানজোড়া জমে যেন বরফ হয়ে গেছে । একটু পরপর কান ডলছে ওরা । এয়ারকভার পরেই আছে ওরা কিন্তু তাতেও যেন বিশেষ কাজ হচ্ছে না । মাইল খানেক যেতেই হাঁপিয়ে উঠলো আভা । দীপু তাকে একরকম টেনে নিয়ে চললো । গত রাতে যখন ড্রাইভ করে এসেছিলো তখন বুঝতে পারেনি কতখানি পথ পেরিয়ে এসেছে । এখন সেই পথ ওর কাছে অসীম মনে হয় ।

দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে । তুষারের বেগও যেন খানিকটা কমে এসেছে । বাতাসের শৈত্যতার অবশ্য কোন তারতম্য হয়নি । পায়ের আঙুলে কোন সাড়া পাচ্ছে না দীপু । কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামালো না ও । আভার অবস্থা বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না । সে চেষ্টা করছে স্বাভাবিক দেখাতে কিন্তু তার ফ্যাকাশে মুখ দেখে রীতিমতো উৎকণ্ঠা বোধ করতে শুরু করেছে দীপু । আর কতখানি পথ বাকী বোঝা যাচ্ছে না । থেমে বিশ্রাম নেবারও কোন অর্থ হয় না । থামলেই ঠান্ডা আরো চাগিয়ে বসবে । বরং এগিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ।

তুষার ঝরা একটি সকাল । এই রকম নাজুক পরিস্থিতিতে না থাকলে এই দৃশ্য রীতিমতো উপভোগ করতো দীপু । খুব সতেজ একটি আমেজ আছে এই দৃশ্যে । বৃষ্টি যেমন সুঁচের মতো ঝাপিয়ে পড়ে তুষারের কণাগুলি সেভাবে পড়ে না । তাদের মধ্যে একধরনের মোলায়েম, আদূরে ভঙ্গী আছে । ঠান্ডা বাতাসের প্রকোপ না থাকলে তুষার কমবেশী উপভোগ্য ।

এই মুহূর্তে তুষার নিয়ে কাব্যি করবার কোন আগ্রহ দীপুর নেই । আভা তার শরীরে প্রায় এলিয়ে পড়েছে । তাকে ঘাড়ে উঠবার প্রস্তাব দিয়েছে দীপু, কিন্তু আভা তাতে রাজী হয় নি । চলার গতি খুব ধীর হয়ে গেছে তাদের । দীপু ধারনা করছে ফ্রিওয়ের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে তারা ।

শেষ পর্যন্ত Route 3 র দেখা মিললো । ঘড়িতে সকাল আটটা বাজে । কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা তাতে গাড়ী নিয়ে কোন সুস্থ মানুষ বের হবে না । আধঘন্টা বসে থাকতে হলো ওদেরকে । শেষপর্যন্ত একটি বরফ সরানো গাড়ী নজরে পড়লো ।

ড্রাইভারটি মাঝবয়সী, বিশালদেহী মানুষ। তাদেরকে দেখে সে দুই চোখ কপালে তুলে ফেললো। -তোমরা এখানে কি করছো?

দীপু সংক্ষেপে পূর্ব রাত্রির কথা জানালো। লোকটি তাদেরকে গাড়ীতে তুলে নিলো। গাড়ীর অভ্যন্তরে আরামপ্রদ উষ্ণতা! ওদের মনে হলো যেন একটি নরক যন্ত্রনার শেষ হলো।

ড্রাইভারটির নাম রেয়ান। সে ওয়ারলেসে পুলিশকে খবর দিলো। মিনিট বিশেকের মধ্যেই লাল নীল বাতি জ্বালিয়ে একটি পুলিশের গাড়ী চলে এলো। রেয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লো ওরা। পুলিশটি তাদের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনে একটি রিপোর্ট লিখে নিলো। সে নিজেই ওদেরকে মার্লবোরো পৌঁছে দিয়ে গেলো।

এপার্টমেন্টে ঢুকেই মেঝেতে ধ্বসে পড়লো আভা। - বেঁচে ফিরবো চিন্তাও করিনি।

দীপু গম্ভীর মুখে বললো - তুমি তো ফিরলে। আমার গাড়ীটার কি হবে?

-আমার চেয়ে আপনার কাছে গাড়ীটাই বড় হলো? আমার একটা কিছু হয়ে গেলে খুব ভালো লাগতো?

-তা লাগতো। এখন টো করে ঐ গাড়ী তুলতে ফালতু কতগুলো ডলার গচ্চা যাবে।

- কি ছোটলোক! রাখেন, দেশে গিয়ে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সবাইকে এলিসার কথা বলে বেড়াবো। মজাটা হাড়ে হাড়ে টের পাবেন তখন।

দীপু প্রত্যুত্তর দিলো না। সে অফিসে ফোন করলো। সুখবর। রাস্তার অবস্থা অতিরিক্ত খারাপ হওয়ায় আজ অফিস বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। বাঁচা গেলো। ওর মাথায় এখন শুধু গাড়ীর চিন্তা ঘুরছে। ট্রিপল এ-র মেম্বারশীপ ছিলো ওর। কিন্তু রিনিউ করাতে খেয়াল নেই। টোয়িং ট্রাক পাওয়া খুব সমস্যা নয়, কিন্তু পঞ্চাশ ষাট ডলার দিতে হবে। সেটা নিয়েও খুব একটি ভাবিত নয়। গাড়ীটার কোন সমস্যা না হলেই হয়।

আভা বাথরুমে গিয়ে ঢুকেছে। খুব তাড়াতাড়ি বের হবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। দীপু একটা টোয়িং কোম্পানীকে ফোন করলো। তারা জানালো ঘন্টাখানেকের আগে কোন টোয়িং ট্রাক পাওয়া যাবে না। অপেক্ষা করারই সিদ্ধান্ত নিলো ও। এই রকম আবহাওয়ায় প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। টোয়িং ট্রাক গুলি অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

টোয়িং ট্রাকটি যখন এসে হাজির হলো, আভা তখনও বাথরুমে। বাধ্য হয়ে আরেকটি চিরকুট লিখতে হলো দীপুকে। এই ড্রাইভারটির নাম বিল। সে শ্বেতাঙ্গ। বিশালদেহী। মুখ ভর্তি দাড়ি। সমানে বক্ বক্ করছে। দীপু তার সব কথাতেই হু হু করে চলেছে। তার একমাত্র চিন্তা এখন গাড়ীটাকে নিয়ে। গতরাতে অন্ধকারে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ বোঝা যায় নি। আলাই মালুম কত ডলারের মামলা!

গাড়ীর অবস্থা দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো দীপু। খুব আলতো একটি টোপ পড়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি। ওটুকু সারাই না করলেও চলবে। টেনে তুলতে গেলো দশ মিনিট। প্রথমবারেই স্টার্ট নিলো। দীপুর মন ভালো হয়ে গেলো। গাড়ী ওর জীবন। গাড়ী ছাড়া নিজেকে রীতিমতো খোঁড়া মনে হয়। তুষার ভেঙে বাসায় ফিরতে ঘন্টাখানেকের উপরে লেগে গেলো। কিন্তু তা নিয়ে ও মোটেই চিন্তিত নয়। মনের আনন্দে সিডি পেয়ারে এয়ার স্মিথের একটি সিডি চালিয়ে দিলো। একেই বলে কপাল। গাড়ীর কিছু হলে ওর ঘুম হারাম হয়ে যেতো।

এপার্টমেন্টে পৌঁছেই খটকা লাগলো ওর। এপার্টমেন্টের দরজা লক করে বেরিয়েছিলো ও। এখন সেটি খোলা। ভেতরে ঢুকে আভার খোঁজ করলো। তার দর্শন পাওয়া গেলো না। টেবিলে একটি চিরকুট পাওয়া গেলো। তাতে লেখা - জনের সাথে বের হলাম। দুপুরে ফিরবো না। রাতে এ্যানের বাসায় পার্টি। ওর ছোটবোনের সুইট সিক্সটিন পার্টি। আপনাকেও দাওয়াত দিয়েছে।

এ্যান আভার ইউনিভার্সিটির বন্ধু। সে বোষ্টনে কাজ করে। তার বাবা-মা, ভাই বোনও বোষ্টনেই থাকে। এ্যানের বাসার ঠিকানা দিয়েছে আভা। কোন ফোন নাম্বার নেই। চিরকুটটা ভাঁজ করে পকেটে ভরলো দীপু। রাগ চেপে রাখবার চেষ্টা করে বিশেষ সফল হচ্ছে না সে। আভার উদ্দেশ্য খুবই ঘোলাটে। জনকে এই বোষ্টনে কেন ডেকে এনেছে সে? এ্যানের সাথে জনের পরিচয় অতি সামান্যই। জনকে বোনের সুইট সিক্সটিন পার্টিতে সে দাওয়াত দেবে না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা আভার কারসাজি। খুব সম্ভবত এলিসা সংক্রান্ত কিছু শুনেছে সে। বানোয়াট কথা বলবার মানুষের অভাব নেই। এখন দীপুর কাছে তাকেও প্রমাণ করতে হবে যে সে-ও নিতান্ত কম যায় না। এ ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা দীপুর মাথায় এলো না। ছেলেমানুষীর একটা সীমা থাকা উচিৎ। কিন্তু এই আবহাওয়ায় জন এলো কি করে? এয়ারপোর্টগুলি তুষারে বন্ধ হয়ে যাবার কথা। নাকি জন আগেই এখানে এসেছিলো? অফিস সংক্রান্ত কিছু? দীপু শ্রাগ করলো। আভার মনের কোন ঠিকঠিকানা নেই। এসব নিয়ে ভাবা অর্থহীন। সে যদি জনের সাথে সময় কাটানো মনস্থ করে থাকে তাতে দীপুর আপত্তি করবার কিছু নেই। রাতে এ্যানের পার্টিতে যাবে কিনা বুঝতে পারছে না। এ্যানের সাথে তার নিজের পরিচয়ও তেমন ঘনিষ্ট নয়। দেখা হলে কেমন আছো, ভালো আছি। ব্যস, আলাপ শেষ। তাকে দাওয়াত দেয়াটা স্বাভাবিক নয়। দীপু ঠিক করলো আবহাওয়া ভালো থাকলে একটা ঢুঁ মেরে আসবে। সে আভার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দীর্ঘ সময় নিয়ে উষ্ণ পানিতে গোছল করলো। খুব আয়েশ করে লাঞ্চ খেলো। সারা রাতের ঘুম যেন দুচোখে। সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। একটি ছোট্ট ব্যাপার অবশ্য তাকে কিঞ্চিৎ বিরক্ত করছে। আভা দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে গেছে। চাবী ছাড়া এই দরজা বন্ধ করা যায় না। কিন্তু সে তো দীপুর জন্য অপেক্ষা করতে পারতো। চুরি-চামারি হবার সম্ভাবনা নিতান্ত কম নয়। কাজটা আভা মোটেও ভালো করেনি। এই রকম দায়িত্বহীনতা গ্রহণযোগ্য নয়।

ফোনের শব্দে ঘুম ভাঙলো দীপুর। বাইরে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেলো ও। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এতো দীর্ঘক্ষণ ঘুমানোর ইচ্ছা ছিলো না তার। রাতে দু'চোখের পাতা এক করা যাবে না। রিসিভার তুললো ও। পিংকির কণ্ঠ।

-ভাইয়া, কোথায় ছিলে তুমি?

-ঘুমাচ্ছিলাম।

-কাল সারারাত ধরে ফোন করেছি। কোথায় ছিলে তোমরা?

দীপু সংক্ষেপে জানালো গত রাতের অভিজ্ঞতার কথা।

পিংকি তিক্ত কণ্ঠে বললো - এই মেয়ে সত্যিই তোমার বারোটা বাজাবে। তোমার কপাল ভালো যে গাড়ীটার কিছু হয়নি। শোনো, আমি দেশে ফোন করেছিলাম। ঘন্টা খানেক আগে। কি জেনেছি শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না।

-কি শুনেছিস?

-আজ সকালে দেশে ফোন করেছিলো আভা। সে নাকি বলেছে এখন দেশে ফেরা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

-কি বলছিস তুই? ওর ফ্লাইট পর্যন্ত ঠিক।

-ঠিকই বলছি। এই মেয়ের মাথার কোন ঠিক নেই। তুমি তাকে নিউইর্য়কের বাসে তুলে দাও। সেখানে তার ভাই থাকে, তার বাসাতে চলে যাক সে।

-দুঃসম্পর্কের ভাই।

-যে সম্পর্কের হোক তাতে তোমার কি? এই ঝুট ঝামেলায় তোমার জড়ানোর দরকার কি? পরে সবাই বলবে তুমিই ওকে বুদ্ধি দিয়েছো। আমার কথা বুঝতে পারছো?

দীপু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। পিংকি ঠিকই বলেছে। সবাই ওকেই দোষারোপ করবে। অথচ এই সবের কিছুই জানে না সে। সম্ভবত তার ফোনেই দেশে কল করেছে আভা। কত ডলারের মামলা কে জানে?

পিংকি বললো- সময় থাকতেই কিছু একটা করো ভাইয়া। পরে কিন্তু দেশে মুখ দেখাতে পারবে না। আব্বা, আম্মা অসম্ভব রেগে আছে তোমার উপরে। তারা সম্ভবত তোমাকে ফোন করবারও চেষ্টা করেছে।

দীপু বললো - আভা গেছে ওর বান্ধবীর পার্টিতে। ও না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

-কি করবে সেটা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু ঐ মেয়েকে দেশে না পাঠালে বিরাট বদনাম হবে।

পিংকি বিস্তর রাগারাগি করে ফোন রেখে দিলো। দীপু প্রগাঢ় বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। পারিবারিক সমস্যার চেয়ে জঘন্য কিছু আর হয় না। ঐ জাতীয় ব্যাপারে নিজেকে জড়ানোর কোন আগ্রহ তার নেই। সে এ্যানের পার্টিতে যাবারই সিদ্ধান্ত নিলো। যেভাবেই হোক আভার সাথে তার দেখা হওয়া প্রয়োজন। তাকে এইভাবে বিপদে ফেলার কোন অধিকার আভার নেই। সে তৈরি হয়ে গাড়ী নিয়ে বের হলো। তুষার থেমে গেছে। চারিদিকে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করবার ধুম লেগেছে। ট্রাফিক বেশ ধীরগতিতে চলছে। বোষ্টন পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে।

এ্যানের বাসা কপ্‌লে স্কোয়ারের কাছাকাছি। খুঁজে পেতে গলদঘর্ম হতে হলো দীপুকে। বোষ্টনের গলি ঘুঁচিতে ঢুকলেই নিজেকে পথহারা মনে হয় ওর। যদিও

বোষ্টনের অবস্থা তেমন খারাপ নয়। কাছে একটি ম্যাপ থাকলে বিশেষ সমস্যা হবার কথা নয়। কিন্তু ঠিকানা খুঁজে বের করতে দীপুর কখনো কোথাও সুবিধা হয়নি। এ্যানদের বাসাটি দোতালা। বাইরে প্রচুর গাড়ী দেখেই বোঝা গেলো পার্টি জমে উঠেছে। গাড়ী পার্ক করে ভেতরে ঢুকলো দীপু। বেশ বড়সড় লিভিংরুম। সেখানেই অভ্যাগতদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক পাশে ড্যান্সিং ফ্লোর। খানিকটা আলো ছায়ার খেলা সৃষ্টি করা হয়েছে সেই এলাকায়। অন্যপাশে পুরো দস্তুর বার। প্রচুর মদ এবং বীয়ারের আয়োজন দেখা যাচ্ছে। অভ্যাগতের সংখ্যা কম করে হলেও পঞ্চাশের কোটায়। দোতলায় নিশ্চয় সুইট সিক্সটিনের বন্ধুবান্ধবীরা। কারণ সেখান থেকে অসম্ভব শোরগোল শোনা যাচ্ছে। এই ফ্লোরে সকলেই বেশ বয়সী।

এ্যান কোত্থেকে যেন উড়ে এলো। - এই দীপু, কেমন আছো?

-ভালো। বেশ ভালো।

-দরজায় দাঁড়িয়ে আছো কেন? ভেতরে এসো।

-আভাকে দেখেছো তুমি?

-কিছুক্ষণ আগেও দেখেছি। নিশ্চয় আশে পাশে কোথাও আছে। একটু ড্রাঙ্ক হয়ে আছে ও।

-কখন এসেছে ও?

-ঘন্টা দুয়েক তো হবেই। জনও আছে ওর সাথে। তোমার জন্য আমার সত্যিই দুঃখ হয়।

-অনেক ধন্যবাদ। তোমার মত করুণাময়ীর দেখা সচরাচর পাওয়া যায় না।

এ্যান খিল খিল করে হাসতে লাগলো। - আমাকে যেতে হবে। তুমি পার্টি উপভোগ কর।

-নিশ্চয়।

দীপু ভীড়ের মধ্যে আভার খোঁজ করতে লাগলো। পেটে কয়েক পেগ পড়ার অর্থ খবর খারাপ। জন সাথে রয়েছে। সে কখনই এই সুযোগ হারাবে না। যত্রতত্র হাত চালান করবার চেষ্টা করবে। দীপু মনে মনে খানিকটা রাগ অনুভব করে। আভার যদি সামান্য কান্ডজ্ঞান থাকে। একটা কেলেংকারী না করলে তার চলছে না।

শেষ পর্যন্ত আভার দেখা পাওয়া গেলো। সে জনের সাথে ড্যান্সিং ফ্লোরে নাচছিলো। নাচের প্রতি প্রচন্ড আসক্তি তার। প্রথমে সেখানেই খোঁজ করা উচিৎ ছিলো দীপুর। প্রায় পনেরো থেকে বিশ জোড়া কপোত কপোতী গভীর আবেশে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঢিমে তালে নাচছে। বলরুম ড্যান্সিং এর সাথে দীপুর পরিচয় অতি সামান্যই। দেখতে অবশ্য মন্দ লাগে না। আভাকে খুঁজে পেতে কোন সমস্যা হলো না। রক্তিম একটি পিঠখোলা লম্বা গাউন পরেছে সে। মসৃণ কালো চুলের রাশি পিঠময় ছড়ানো। মুখে সযত্ন মেকআপ। পায়ে হাই হিল। আভাকে অপ্সরী মনে হচ্ছে। জনকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আছে সে। তার দৃষ্টি ঢুলুঢুলু। জনের হাত তার নিতম্বে খেলে বেড়াচ্ছে। দীপুর মাথায় রক্ত উঠে গেলো। ড্যান্সিং ফ্লোরে উঠে গেলো সে। আভার পিঠে আলতো করে খোঁচা দিলো। আভা তাকে দেখ ফিক্ করে হেসে ফেললো। জন 'হাই' জাতীয় কিছু একটা বলে সম্বোধন করলো। দীপু কানেও নিলো না। আভাকে হাতের ইশারায় ওর সাথে আসতে বললো। আভা সামান্য দ্বিধা করছে। জন বললো - ও যেতে চাইছে না। দেখছো তো আমরা নাচছি।

দীপু আভাকে লক্ষ্য করে বললো- তুমি আমার সাথে এসো, আলাপ আছে।

জনের পেটেও সম্ভবত বেশ কয়েক পেগ পড়েছে। সে হাতের ঝাপটায় দীপুকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। কাজটা ঠিক হলো না। দীপু কান্ডজ্ঞান হারালো। জনকে দু'হাতে চেপে ধরে ঠেলে মেঝেতে আছড়ে ফেললো সে। জন প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে, দু'হাতে সমানে ঘুষি ছুড়ছে সে। দীপু ঘুষি ঠেকিয়ে পাল্টা আক্রমণ করবার চেষ্টা করছে। জন আকৃতিতে বিশাল। বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না দীপু। বেশ কয়েকজন যুবক দ্রুত এগিয়ে এলো মিটমাট করতে। কিছু বুঝে উঠার আগেই দীপুর কপালে ঠাঁই করে একটি আঘাত হানলো জন। প্রায় শূণ্যে উঠে গেলো দীপুর হালকা শরীর। সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিশাল এক চীৎকার দিয়ে ছুটে এলো আভা। জনকে লক্ষ্য করে লাথি ছুড়তে গিয়ে হাই হিলে ভারসাম্য হারিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়লো সে। রীতিমতো একটি হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো। সামান্য সুস্থির হতেই আভার হাত ধরে টানলো দীপু। - চলো।

-আমার একখানা জুতা খুঁজে পাচ্ছি না।

-চুলায় যাক জুতা।

আভা শেষ পর্যন্ত আরেক পাটি জুতা খুঁজে পেলো। দু'পাটি জুতা হাতে ঝুলিয়ে খালি পায়ে দীপুকে অনুসরণ করলো সে। জন পিছু ডাকছে। - এই আভা, কোথায় চললে তুমি? হচ্ছে কি এসব?

দীপুর কপাল কেটে গেছে। বেশ রক্ত পড়ছে। গাড়ীতে গিয়ে টিসু পেপার দলা পাকিয়ে ক্ষতস্থানে চেপে ধরলো সে। আভা ভীতকন্ঠে বললো-খুব বেশী কেটেছে? হাসপাতালে যাবেন?

দীপু তার কথার কোন জবাব দিলো না। সে গাড়ী ষ্টার্ট দিলো। এ্যান ছুটে এসেছে -দীপু, কেমন বোধ করছো তুমি? ভেতরে এসো, আমি তোমার মাথায় পট্টি বেঁধে দেবো।

-দরকার নেই। আমি ভালো আছি।

দীপু একহাতে কপাল চেপে ধরে অন্য হাতেই ড্রাইভ করছে। পার্কিং লট থেকে গাড়ী বের করে রাস্তায় নামলো সে। এ্যান চিৎকার করছে - ড্রাইভ করতে পারবে তো? অসুবিধা হলে আভাকে ড্রাইভ করতে দাও।

দীপু গাড়ী ছোটালো। আভা তার ব্যাগ থেকে একটি রুমাল বের করে বললো- এটি চেপে ধরেন।

দীপু গম্ভীর কন্ঠে বললো - দরকার নেই।

আভা কাঁদতে শুরু করলো। - আপনি কেন খামোকা মারামারি করতে গেলেন। আমরা তো নাচছিলাম!

-মদ কি পরিমাণ টেনেছো তুমি?

-মাত্র কয়েক পেগ।

-জন এখানে কি করছে?

-এ্যান ওকে দাওয়াত দিয়েছে।

-একদম বাজে কথা বলবে না। এ্যান ওকে ভালোমতো চেনেও না।

-আপনি এইরকম ধমক দিয়ে কথা বলছেন কেন?

-দেশে ফোন করেছিলে কেন?

-আপনি কি করে জানলেন?

-প্রশ্নের জবাব দাও।

-এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

-না। এটা আমার ইজ্জতের সওয়াল। দেশে ইতিমধ্যেই তোলপাড় উঠে গেছে। সবাই ভাবছে তোমার এই সিদ্ধান্তের পেছনে আমার হাত আছে। আমার জানা দরকার তোমার বাবা মাকে তুমি কি বলেছো।

-মনে তো হচ্ছে ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছেন।

-সবটুকু নয়।

-কতটুকু জেনেছেন?

-বেশী চালাকী করো না। তোমার মুখ থেকে আমি পুরোটা শুনতে চাই।

-বলেছি আমি এখন দেশে ফিরবো না।

-আর কি বলেছো?

-আর কিছুই বলিনি।

-খুব চালাক হয়েছো? ঠিক আছে। তোমার চালাকী আমি বের করবো।

তোমার পেন কবে এবং কখন? ঠিকঠাক বলবে।

-আগামীকাল বেলা এগারোটায়।

-বেশ। ঐ পেনে চেপে তুমি দেশে যাচ্ছো। দেশে গিয়ে তোমার যা ইচ্ছা করো। কিন্তু আমার বাবা - মা তোমার জন্যে অপমানিত হবে সেটা হচ্ছে না।

-আমি কোথাও যাচ্ছি না।

-সে কাল দেখা যাবে।

-আপনি আমাকে জোর করে পাঠাবেন?

-হ্যাঁ।

-এমন পাষাণ কেন আপনি?

-একদম এ্যাকটিং করবে না। তোমার জন্যে কপাল ফাটলো। তোমার ঢং আমার মোটেই সহ্য হচ্ছে না এখন।

-আমি মোটেই ঢং করছি না। আপনার হৃদয় বলে কিছু নেই।

-না থাকলেই ভালো। মুখ বন্ধ করে বসে থাকো।

-আপনার কথা মতো কাজ করতে হবে নাকি আমাকে? আমাকে কেউ ছুঁলে আপনার সমস্যা কি? লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে কুস্তাকুস্তি করতে লজ্জা হয় না? জনকে লাথি মারতে গিয়ে আমার পা মচকে গেছে।

-বেশ হয়েছে। দেশে ফিরে গিয়ে এই গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলো।

-এলিসার কথাও বলবো।

-বলো। তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

-সে দেখা যাবে।

এপার্টমেন্টে পৌছেই কপালের ক্ষতটা পরীক্ষা করলো দীপু। ক্ষতটি ছোট। রক্তপাত ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়েছে। আভা তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বললো
-ব্যান্ডেজ বেঁধে দেবো?

-তোমাকে এতো দরদ দেখাতে হবে না ।

-এতো রাগ দেখাবেন না । দোষ আমার একার না ।

- আমার দোষটা কোথায়?

-মারপিট শুরু করলেন কেন আপনি?

-ও আমাকে ঠেলা দিলো কেন?

-একটু ঠেলা দিলেই মারপিট করতে হবে?

-জন এখানে কি করছে সেই প্রশ্নের উত্তর আগে দাও ।

-বলেছি তো এ্যান তাকে দাওয়াত দিয়েছে ।

-সেটা সত্যি নয় । আমি সত্যি কথাটি শুনতে চাই ।

আভা ইতস্ততঃ করে বললো -রাগ করবেন না তো?

-না ।

-আমিই তাকে আসতে বলেছিলাম ।

-সেটা আমি বুঝতে পেরেছি । কেন, সেটা বল? তুমি কি তাকে ভালোবাসো? দেশে ফিরে যেতে চাও না কেন? জনের জন্য? তোমার ধারণা সে তোমার যোগ্য ছেলে?

-জনের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই ।

-তাহলে ও বোষ্টনে কেন? স্রেফ একপাক নাচার জন্যে?

আভা অপরাধী কণ্ঠে বললো - আমি দেখতে চেয়েছিলাম আমার প্রতি আপনার এখনও আগের মত অনুভূতি আছে কিনা?

দীপু কয়েক মুহূর্ত থমকে গেলো । - তুমি বলছো, এই পুরোটাই তোমার পরিকল্পনা?

আভা সজোরে ঘাড় নাড়ালো - হ্যাঁ ।

-তুমি চাইছিলে আমি জনের সাথে মারপিট করি?

আভা আবার ঘাড় নাড়ালো - হ্যাঁ ।

-কি বুঝলে? তোমার প্রতি আমার অনুভূতি কেমন?

আভা মুচকি হাসছে । - আগে যেমন ছিলো ।

দীপু তার গালে ঠাস্ করে একটি চড় বসিয়ে দিলো ।

-তোমার হাতে বহুবার ঘাই-গুতো খেয়েছি । এই চড়টা তোমার পাওনা ছিলো । শুধু আজকে নয়, অনেকদিন ধরে ।

আভা কাঁদো কাঁদো গলায় বললো - আপনি আমাকে মারলেন?

-হ্যাঁ । এবং তোমার জানা দরকার, আমার মনে তোমার প্রতি কোন দূর্বলতা নেই ।

আভা ছলছল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বেডরুমে ঢুকে গেলো । সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো দরজা । দীপু বিশেষ রকম আত্মতৃপ্তি অনুভব করলো । বহুদিনের বহু অপমানের শোধ তোলা গেছে । মহা শান্তি!

রাতে আভার দেখা মিললো না । লিভিংরুমে শয্যা পাতলো দীপু । কপালের ক্ষতটি প্রায় বুজে এসেছে । বেশ রক্তপাত হয়েছে । কিঞ্চিৎ দূর্বলবোধ করছে সে । ক্লান্তিতে তার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে । কিন্তু না ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে । আভাকে কোন বিশ্বাস নেই । পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে সে । সাবধানের মার নেই । সোফা সেটটি দরজার সামনে আড়াআড়িভাবে রেখে তার উপরেই শুয়ে

পড়লো সে। কিন্তু তারপরও সমস্যা থেকে যায়। কাঁচের স্লাইডিং ডোর ঠেলে বেলকনিতে বেরিয়ে যেতে পারে মেয়েটা। মাটি থেকে ফুট দশেক মাত্র উঁচু সেটি। লাফিয়ে পড়াটা অসম্ভব নয়।

সারারাত একরকম জেগেই কাটলো দীপুর। তবে সুখের কথা এই যে পালানোর কোন চেষ্টা করেনি আভা।

১৮

সকালে শান্ত সুবোধ মেয়ের মতো বাক্স পেটরা গুছিয়ে ফেললো আভা। নিজের এবং দীপুর জন্য নাস্তা পর্যন্ত তৈরী করলো। দীপু নাস্তা ছুঁলো না। ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছে কিনা কে জানে। এই মেয়েকে কোন বিশ্বাস নেই। আভা বেশ ক্ষুধার্ত ছিলো। দীপুর নাস্তাও সে সাবড়ে দিলো।

এয়ারপোর্টে যাবার দীর্ঘ পথে মাত্র দু'বার আলাপ হলো তাদের। প্রথমবারে আলাপ শুরু করলো আভা।

-আপনি নিশ্চয় ভাবছেন আমি শুধুমাত্র আপনাকে জ্বালাতে এত পথ এসেছিলাম।

-না। তুমি এই অবসরে আরো অনেককেই জ্বালিয়েছো।

-বাজে কথা বলাটা আপনার স্বভাব হয়ে উঠছে। আমি আসলে এসেছিলাম শীলা ম্যাকনিলের সাথে ভাইয়ার ব্যাপারে আলাপ করতে।

-সেটা বুঝতে আমার বাকী নেই।

-সব সময় এমন সবজান্তার মতো আচরণ করবেন না। আমার আরো একটি উদ্দেশ্যও ছিলো। এ্যানের বোনের সুইট সিক্সটিন পার্টিতে যাওয়া।

-তোমার সেই ইচ্ছাও পূরণ হয়েছে।

-নিজেকে আপনি কি ভাবেন? আমার আরো একটি উদ্দেশ্য ছিলো।

-তিনটা উদ্দেশ্য থাকাই নিয়ম।

-খুব খুঁচিয়ে কথা বলা শিখেছেন? অথচ কাউকে ভালোবাসলে সেই কথাটা একজন সুস্থ পরিণত মানুষের মতো কিভাবে বলতে হয় সেটাই শেখেন নি।

-আমি কাউকে ভালোবাসি না। আমি পাষাণ হৃদয়।

আভা বিশেষ কায়দায় জিভ দেখিয়ে প্রথম পর্যায়ের আলাপের যবনিকা টেনেছিলো।

দ্বিতীয় আলাপটিও আভাই শুরু করে।

-দীপু ভাই, চলেন আমরা বিয়ে করে ফেলি।

-কাকে বলছো?

-এই গাড়ীর ড্রাইভারকে।

-এই গাড়ীর ড্রাইভার তোমাকে চার বছর আগে একবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো। তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

-বেশ করেছিলাম। আপনার তখনো বিয়ের বয়স হয়নি। মুখ টিপলে দুধ বের হয় এমন ছেলেকে কোন মেয়েই বিয়ে করবে না।

-বাজে কথা বলারও একটা সীমা থাকে।

-আচ্ছা ঠিক আছে। সত্যি কথাই বলবো। আপনার সাথে খুনসুটি করতে আমার বরাবরই ভালো লাগতো। ঝট করে সেটা নষ্ট করতে চাইনি। সত্যি করে বলেন, গত চারটা বছর কম বেশী উপভোগ করেননি আপনি?

-তোমার মাথার ঠিক নেই। দেশে ফিরেই হেমায়েতপুরে একটা দর্শন দিয়ে আসবে। তোমার মতো মেজাজী মদ্যপ মেয়েকে বিয়ে করবো এমন গর্দভ আমি নই।

-আমি মদ্যপ! কেন আপনি ফুক্ ফুক্ করে বিড়ি ফুকছেন না সর্বক্ষণ? রাতে ঘুমের মধ্যে খুক্ খুক্ করে কাশে কে? আবার আমাকে বলা হচ্ছে!

দীপু চুপ করে যায় এই পর্যায়ে। কিন্তু আভা আলাপটি বন্ধ হতে দেয় না। সে আবার বলে - দীপু ভাই, আমি সিরিয়াস। চলেন, আমরা বিয়ে করে ফেলি।

দীপু দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো - তোমার দেশে যাওয়াটা দরকার। তোমার বাবা-মায়ের মন্দ কথা শুনতে আমি আগ্রহী নই।

-দেশে গেলে আমি যদি আর ফিরে না আসি?

-ধরে নেবো সেটিই আমাদের ভবিষ্যৎ।

আলাপ এখানেই থেমে যায়।

আভার ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জারদের ডাক পড়েছে। তারা দু'জন নিঃশব্দে পাশাপাশি বসে ছিলো। ডাক শুনেই আভা উঠে দাঁড়ালো। দীপু ঘড়ি দেখলো। ফ্লাইট যথাসময়েই ছাড়বে মনে হচ্ছে। রানওয়ে পরিষ্কার করতে এরা অসম্ভব তৎপর। একটা ফ্লাইট বন্ধ হওয়া মানে প্রচুর ক্ষতি।

আভা বললো - দীপু ভাই, আমার কথা মনে থাকবে তো?

দীপু গম্ভীর মুখে বললো - এই সময়ে কোন নাটক করো না। যথেষ্ট হয়েছে।

-আমার সব কিছুই আপনার কাছে নাটক মনে হয়। নিজেকে মহাপুরুষ ভাবেন নাকি?

-কি আবোল তাবোল কথা বলছো! যাও, ভেতরে ঢুকে যাও। এখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করবার কোন অর্থ হয় না।

-আপনার সাথে ঝগড়া করতে আমার বয়ে গেছে। দেশে গিয়ে সবাইকে বলবো আপনি অকারণে আমাকে থাপ্পড় দিয়েছেন।

-বলো। তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই জানে তুমি একটা পাগলী।

-জ্বি না। আমি পাগলী নই। আপনিই পাগল।

-ভেতরে ঢোকো।

আভা ঠোঁট বাঁকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে সে তার মধ্যম আঙুল দেখালো। দীপুর মুখ থমথমে হয়ে যেতে দেখেই তার মুখে বিশেষ আনন্দের হাসি ফুটে উঠলো।

দীপু ফ্লাইট ছেড়ে যাবার পরও বিশেষভাবে নিশ্চিত হবার জন্য এয়ারপোর্টে ঘন্টাখানেক পাহারা দিলো।

ফিরতি পথে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো সে। এই মেয়েটিকে সে অসম্ভব ভালোবাসে। সে জানে এই কথা, আভা জানে এই কথা। অধিকাংশ পরিচিত মানুষই জানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব সম্ভবত আভা অন্য কারো হয়ে যাবে। বাবা মাকে সে একটা ফোন করবে। কিন্তু তারা একই প্রস্তাব নিয়ে দ্বিতীয়বার যেতে চাইবেন কি?

ফোনটি বাজছে। দীপু ধরবে না বলেই ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু সেই অসহনীয় বাজনা থামার কোন লক্ষণ নেই। যেই আনসারিং মেশিন চলে আসছে অমনি লাইন কেটে দেয়া হচ্ছে। নতুন উদ্যমে বেজে চলেছে রিংগার। এই যন্ত্রণার শেষ কোথায়। অতি কষ্টে দু'চোখের পাতা অর্ধেকটা খুলে ঘড়ি দেখলো দীপু। রাত আড়াইটা! ফ্রেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। বাইরে টুপটাপ তুষারের বৃষ্টি। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে লেপ ছেড়ে আড়াইটার সময় কাউকে টেনে তোলার মতো অর্বাচীন কে হতে পারে? দীপু বিছানা ছাড়লো। দেশ থেকে হবার প্রশ্নই আসে না। আব্বা-আম্মা খুব হিসেব করে ফোন করেন। এই প্রহরে ভুলেও ফোন করবেন না তারা। লিভিংরুমে এসে ফোন ধরলো সে। - হ্যালো।

- এই দীপু ভাই, কেমন আছেন?

- কে? আভা?

- হ্যাঁ। কেমন তুষার পড়ছে?

- অল্প স্বল্প। তুমি কোত্থেকে?

- আন্দাজ করেন।

- ঢাকা থেকে?

- ফোনটা রেখে বেলকনিতে একটু উঁকি দেন।

দীপু স্বয়ংক্রিয়ের মতো আদেশ পালন করলো। ঠিক রাস্তার উপরে একটি আন্ত ঃস্টেট ট্যাক্সি দাঁড়ানো। ভেতরে আভার হাসি মুখ। তার হাতে সেলুলার। নিশ্চয় ট্যাক্সি ড্রাইভারের।

এসে ফোন ধরলো দীপু। - তুমি এখানে কি করছো?

- আপনাকে বিয়ে করতে এলাম। কিন্তু তার আগে দয়া করে একটু নীচে আসবেন? ড্রাইভারটাকে বিশ ডলারের লোভ দেখিয়েও লাভ হলো না। সে কিছুতেই আমার বাক্স ছোঁবে না। তুলতে গিয়ে নাকি তার কোমরে চোট লেগেছে।

দীপু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ফোনটি ক্রাডলে নামিয়ে রাখলো। এই ঠান্ডার মধ্যে এই ভাবে যন্ত্রণা দেওয়ার কোন অর্থ হয়? এই মেয়েটির কান্ডজ্ঞান হবে কবে? নিজের বাবা মায়ের প্রতিও তার বিস্তর রাগ হয়। ছেলে অনুরোধ করলো বলেই এমন একটি কাজ তাদেরকে করতে হবে? আভা ড্রাইভারটির সামনেই দীপুকে কষে একটা চুমু খেলো। কি যন্ত্রণা!